KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কল-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 5/1 5/4 6/1 6/2	Year of Publication : July 81 Jan - March - April - Jun 82 Oct 82 Oct - Dec 82, Jan - March 83
	Condition : Brittle / Good
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিপ্লব

১৫

বাংলা সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত ১৯৭৭

1980 সালে যে ভিত ফেলেছি,
আসুন 1981-তে
তার ওপর নির্মাণ শুরু করি

রাশছাড়া মুদ্রাস্ফীতি 1980-তে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে
এবং কয়লা, বিদ্যুৎ, শিল্পপণ্য ও
খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা গিয়েছে।

এখন সময় এসেছে সেই
সাফল্যগুলিকে স্থিতিশীল
ক'রে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়াসী
হওয়ার, সমাজের কোনও অঙ্গ
জাতীয় আয়ের মোটা অংশ
দাবী করার আগেই
তা করা দরকার।

কঠোর শ্রম ও স্বাবলম্বন
এই দুটি মন্ত্র পুঁজি করুন

devp 80/450

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বর্ষা সংখ্যা
শ্রাবণ ১৩৮৮
বিভাব

প্রবন্ধ

'দুরূহের দারুণ আকর্ষণে'
কবিতা-অনুবাদের সমস্যা, অভীষ্ট ও পদ্ধতি। অরুণকুমার ঘোষ ১
ইংরেজি ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথ। নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৬০

গল্প

বুকের ছবি। সুতপন চট্টোপাধ্যায় ৪৮

কবিতাগুচ্ছ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে। রাণা চট্টোপাধ্যায় ৭২
তন্ত্রবিষয়ক কবিতাগুচ্ছ। তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের এপিটাফ। পিনাকী ভাদুড়ী ৭৮
সম্পাদকীয় ৮৪

চিঠিপত্র

প্রফুল্ল কিশোর মুখোপাধ্যায় ৮৭
রথিন মিত্র / নীতা নন্দী ৮৮

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার
প্রদীপ দাশগুপ্ত দেবীপ্রসাদ মজুমদার
শচীন দাশ

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস
কলকাতা-৭০০০১৭

সম্পাদক
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রচ্ছদ : অনুপ রায়
অলংকরণ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
কভার মুদ্রণ : করুণা আর্ট প্রেস

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রিন্টার্স, ১৩৮ বিধান সরণী কলকাতা-৪ ও রূপলেখা, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রবন্ধ

'দুরূহের দারুণ আকর্ষণে'

কবিতা-অনুবাদের সমস্যা, অভীষ্ট ও পদ্ধতি

অরুণকুমার ঘোষ

সৃষ্টিমূলক রচনার অনুবাদমাত্রেই কঠিন। ভাষান্তরে তার বিষয়বস্তু ও রূপকল্পের অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। এই কারণেই সাহিত্যসৃষ্টির অনুবাদপ্রয়াস যে প্রায় অসম্ভব ও অসাধ্যের পশ্চাদ্ধাবন—একথা বহুলউচ্চারিত হতে শুনেছি আমরা। সেরভান্তিসই যেন বলেছিলেন যে, এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনুবাদ পাঠের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, একটি ফ্লেমিশ ট্যাপেস্ট্রির উল্টো দিকে চেয়ে দেখার মতো। অনুবাদকের ভূমিকার অসহায়তা ও শক্তিহীনতার ওপর জোর দিতে, কেউ কেউ আবার অনুবাদকের দুর্দশার সঙ্গে ট্যান্টালাস এবং সিসিফাসের দুর্দশার তুলনা করেছেন। আবার একজন—জে. লেহ্‌মান—বলেছেন, অনুবাদ সম্পর্কে কথা বলা অনেকটা একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, যখন ঐ ছবিটাই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তখন তার বাইরেকার কাঁচের আবরণ সম্পর্কে কথা বলার মতো।

অনিবার্যভাবে কবিতা-অনুবাদের ক্ষেত্রেই এই নিষ্ফলতার বোধ, এই ক্ষুব্ধ অভিযোগ সবচেয়ে তীব্র ও স্পষ্ট ভাষা পায়, যেহেতু ঐ নির্দিষ্ট সাহিত্যরূপের স্বভাবধর্মহেতু বাধা আরও দুর্লঙ্ঘ্য, সমস্যা আরও দুর্মোচ্য হয়ে ওঠে সেখানে। বাস্তবিক, একটি ভাষার গহন মর্মস্থল থেকে উঠে আসে যেন একটি কবিতা, ঐ ভাষার শরীরে সে মিশে থাকে ওতপ্রোত হয়ে, ঐ ভাষার সমস্ত সম্পদকে ব্যবহার ক'রে তার ধারণশক্তির গভীরতম তল যেন সে ছুঁয়ে যায়। ইন্দ্রিয়-সংবেদী আবেগ, কল্পনার বর্ণিল বিভঙ্গ, সূক্ষ্ম দ্যোতনার স্তরান্বিত আলোছায়া,

নানান্ অনুষঙ্গ, গহনসঞ্চারী প্রতীক ও প্রতিমা, ধ্বনির মোহময় স্পন্দন, বিচিত্র ছন্দঃস্পন্দ, এসবকে ঘিরেই, এসবকে নিয়েই কবিতার, বিশেষ ক'রে গীতিকবিতার, মায়াবী ঐশ্বর্য। কবিতার এই সংগোপন দ্যোতনার কথা কতজনেই না কত বিচিত্রভাবে উপস্থাপন করেছেন! মার্কিন কবি হার্ট ক্রেন উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি কবিতার সমগ্র নির্মাণ গড়ে ওঠে 'লজিক অফ্ মেটাফর'-এর সজীব নিয়মের ওপর ভিত্তি ক'রে।[১] উইলিয়ম এম্প্সন সকল সার্থক কবিতার মধ্যে নিহিত দেখেছেন অ্যাম্বিগুইটিকে, যে অভিধার দ্বারা তিনি বুঝোতে চেয়েছেন: 'যে-কোনও শব্দগত সূক্ষ্মতার স্তরকে, তা সে যত সামান্যই হোক, যা একই ভাষারচিত অংশের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রতিক্রিয়াসমূহের অবকাশ রচনা করে।'[২] আর ডিলান টমাস কাব্যশিল্পের রহস্য উদ্ভাসিত করতে গিয়ে দেখেছিলেন যে, কবিতার স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, মিল এবং ছন্দঃস্পন্দ প্রভৃতিতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কারিগরিও সব সময় কাব্যকর্মে ছিদ্র ও ফাঁক রেখে দেয়, যাতে কবিতার মধ্যে নেই এমন কিছু, বুকে হেঁটে, হামাগুড়ি দিয়ে, বিদ্যুৎ-চমকে বা বজ্রের গম্ভীর নিনাদে প্রবেশ করতে পারে।[৩] যেভাবেই এই সংগোপন দ্যোতনাকে বোঝানো যাক্, এর জন্যই কবিতার অনুবাদককে ঝুঁকি নিতে হয় সবচেয়ে বেশি, যেহেতু একটুতেই মূলের ভাবগভীরতার হানি, তাৎপর্যের বিকৃতি বা রূপসুষমার অপচয় ঘটে যাবার ভয় থাকে। এই কারণেই বিশেষভাবে কবিতার অনুবাদ যে দারুণ দুরূহ এমনকি অসম্ভব[৪], যত ক্ষমতাশালী কবিই হোন তিনি যে কখনই কোনও কবিতার সঠিক প্রতিবিম্ব অনুবাদে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না—এ ধারণায় বহু প্রাজ্ঞকণ্ঠ বহুকাল ধরেই মুখর হয়ে উঠেছে। প্রধানত কবিতার অনুবাদের কথা ভেবেই নিশ্চয়ই শ্রীঅরবিন্দের মনে হয়েছিল যে, সম্পূর্ণ সার্থক অনুবাদ সীমায়িত কালের মধ্যে অসীমতাকে বন্দী করার চেষ্টার মতোই প্রতারক।[৫] জর্মান কবি হাইনরিখ হাইনে, অনুবাদকের অনুবাদ্য রচনার তীব্র ও বিলীয়মান সৌন্দর্যের পুনরুদ্ধার-প্রয়াসকে এক অদ্ভুত বাক্‌প্রতিমার দ্বারা, যার ইংরেজী ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় 'straw-plaiting sunbeams', আখ্যাত করতে চেয়েছেন। রেনাতো পোগিওলির অনুধাবন[৬] থেকে সূত্র নিয়ে আমরা অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারি, মৌলিক কবিতায় জগতের কোলাহল-ক্লিন্ন বিশৃঙ্খলায় প্রায়শ-অশ্রুত স্বর্গীয় সঙ্গীতের পুনঃপ্রকাশ-প্রচেষ্টাকে যদি অনুবাদপ্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা যায়, তাহলে সেখানকার অধিকাংশ প্রয়াসকেও কি ঐ নিষ্ফলতা-দ্যোতক বাক্‌প্রতিমায় চিহ্নিত করতে হয় না? কাব্যানুবাদ-প্রচেষ্টার অনর্থকতা-সূচক এই মতেরই

অতিশয়িত অভিব্যক্তি দেখি, ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকের ফরাসী কবি জ্যু বেলে আর একালের মার্কিন কবি রবার্ট ফ্রষ্টের চিন্তায়। ফ্রষ্ট কবিতার সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে কবিতা হচ্ছে, 'হোয়াট গেট্‌স লেফ্‌ট আউট ইন্ ট্রান্‌স্লেশন।'—অর্থাৎ যা অনুবাদ্য নয় তাই কবিতা।

একটি কবিতার সৃষ্টির মূলে থাকে একদিকে কবির ব্যক্তিত্ব, অন্যদিকে তার অব্যবহিত দেশকালের আবেষ্টন ও তাঁর ব্যবহৃত ভাষার বিশেষ স্বভাব, তার স্বাতন্ত্র্য। বিভিন্ন ভাষার মধ্যে গভীর পার্থক্য কার্যত চিন্তাপদ্ধতি 'এবং জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই সূচিত করে। একটি ভাষার মূলে থাকে একটি বিশেষ জাতির নিজস্ব সংস্কার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবনযাপন ও জীবনবোধের বিশিষ্ট ধরন। ভিন্ন ভাষার আধারে স্থাপিত হয়ে স্বভাবতই ঐসব উপাদান তাদের মৌল প্রকৃতি, স্বাভাবিক সজীবতা হারিয়ে ফেলে। সাধারণ-ভাবেই অনুবাদপ্রচেষ্টায় প্রথমে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয় তা হল বিভিন্ন ভাষার মধ্যে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য। গ্রীক ভাষায় প্রায় সব বাক্যই একটি কানেক্‌টিভ্ দিয়ে শুরু হয়। ইংরেজীতে কানেক্‌টিভের ব্যবহার অনেক কম। ফলে গ্রীক থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের সময়ে, সমস্ত গ্রীক কানেক্‌টিভগুলিরই ভাষান্তর করে দিলে তা হবে অতি-অনুবাদের পর্যায়ভুক্ত। লাতিনে একটি শব্দে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রকাশ করা যায়, সেখানে সর্বনাম (pronouns), নির্দেশক ও অনির্দেশক প্রত্যয় (articles), পদান্বয়ী অব্যয় বা অনুসর্গ (prepositions) জায়গা জোড়ে না। ফলে গ্রীক ভাষার তুলনায় লাতিন ভাষা থেকে ইংরেজী অনুবাদে মূলের চেয়ে অনুবাদককে বেশি শব্দ ব্যবহার করতে হয়। লাতিনের তুলনায় ইংরেজীতে স্বরবর্ণের অনুপাতে ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারও বেশি। আবার 'I hired a worker'—এই ইংরেজী বাক্যটি রুশ ভাষায় সঠিকভাবে অনুবাদ করতে গেলে দুটি অতিরিক্ত সংবাদ জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে: (১) ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়েছিল কি হয় নি; (২) কর্মটি (worker) পুরুষ অথবা স্ত্রী। ইংরেজী বাক্যটির ক্ষেত্রে সংবাদদুটি অবান্তর, অথচ রুশ অনুবাদের ক্ষেত্রে তারা অপরিহার্য, যেহেতু ঐ দুটি সংবাদের ওপর নির্ভর করেই রুশ অনুবাদক ক্রিয়া এবং বিশেষ্য নির্বাচন করবেন। রোমান য়াকবসনের একটি লেখায়[৭] আমরা একটি মজার তথ্য পাই: বরিস পাস্তেরনাকের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম ইংরেজীতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় My Sister Life, যা রুশ ভাষায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যেহেতু ঐ ভাষায় 'জীবন' স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ; চেক্ কবি জোসেফ হোরা কিন্তু

ঐ কবিতাগুলি চেক্ ভাষায় অনুবাদ করতে গিয়ে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েছিলেন, কারণ চেক্ ভাষায় 'জীবন' পুংলিঙ্গবাচক শব্দ।

বাক্‌সংকেতের সাহায্যে অভিজ্ঞতার পৃথকীকরণ যেহেতু কোনও দুটি ভাষায় ঠিক একই উপায়ে নিষ্পন্ন হয় না, তাই এক ভাষার শব্দের অপর ভাষায় যথার্থ তুল্য অর্থসূচক শব্দ ঠিক মেলে না। এমনকি এক ভাষার একটি শব্দের অন্য একটি ভাষায় কোনোই প্রতিশব্দ নেই, এমন দৃষ্টান্তও মোটেই বিরল নয়। ইংরেজী 'house' বা 'residence'-এর ফরাসী প্রতিশব্দ থাকলেও 'home'-এর কোনও ফরাসী প্রতিশব্দ নেই। তেমনি ফরাসী 'menu' ও লাতিন 'augur'-এর নেই কোনও ইংরেজী প্রতিশব্দ। আবার 'সবার কিছু অভিমান থাকে/যা তার নিজস্ব'[৮]—এই অতি সহজ কাব্যিক বিবৃতিটি ইংরেজীতে কিভাবে ভাষান্তরিত করবেন একজন অনুবাদক? বাংলা ভাষার 'অভিমান' শব্দটির ইংরেজীতে তো কোনোই প্রতিশব্দ নেই, আর এই থাকা-না থাকায় বিস্মিত হয়ে ওঠে একদা শাসক-শাসিত সম্পর্কে যুক্ত দুই জাতির দুই স্বতন্ত্র মানসিকতার নিশ্চিত পরিচয়। আবার অনেক সময় একটি ভাষার একটি শব্দের অন্য ভাষায় যদি বা প্রতিশব্দ মেলে, দুটি শব্দের অনুষঙ্গ ও দ্যোতনায় পার্থক্য ঘটে যায়, অথবা মূল শব্দটির মতো তার প্রতিশব্দটি উজ্জ্বল, বর্ণচ্ছুরিত, প্রাণময় প্রতিভাত হয় না। বাস্তবিক, এমনকি একটি ভাষার সহজতম শব্দগুলিও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ, সামাজিক প্রয়োগবিধি ও অন্বয়গত ঐতিহ্যের বিশিষ্টতা বহন ক'রে চলে। কোনও জাতীয় বা স্থানীয় অনুভূতির গভীর প্রদেশ থেকে তারা উঠে আসে উক্তির উপরিতলে। তাই pain শব্দের উচ্চারণ যে অভাব ও দাবীর সুর ধ্বনিত ক'রে তোলে, bread শব্দের উচ্চারণ সে সুর ধ্বনিত ক'রে তোলে না। আবার Ein Stückchen Brot, un morceau de pain, un trozito de pan—এই তিনটি শব্দ-বন্ধই ইংরেজীতে একই 'a morsel of bread'-রূপে ভাষান্তরিত হবে, কিন্তু শব্দগুলির ধ্বনিগত ভিন্নতা উদ্দিষ্ট খাদ্যবস্তুর আকৃতি, বর্ণ, আয়তন, ওজন, স্বাদ ও খাদকের মনোভঙ্গীতে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকেই প্রকাশ করে দেয়। এই পার্থক্যের কথা মনে রেখেই তো রবার্ট গ্রেভ্‌স বলেছেন যে, অনুবাদক অবশ্যই উপলব্ধি করবেন যে অনুবাদ একটি ভদ্র মিথ্যা হতে পারে, কিন্তু মিথ্যা তা নিশ্চয়ই।[৯]

ভাষান্তরের এই সাধারণ সমস্যা ছাড়াও কবিতার অনুবাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বলাই বাহুল্য কিছু বিশেষ রূপগত সমস্যা। উক্তি ও উপলব্ধি বা বাক্ ও অর্থ বা ভাব ও রূপ বা প্রসঙ্গ ও প্রকরণ—যাই বলি না কেন—এ দুয়ের অচ্ছেদ্য-

যোগে নিষ্পাদিত হয়ে ওঠে একটি সার্থক কবিতা। বিষয় ও ভাষার মধ্যেকার নিগূঢ় সম্পর্ক, ধ্বনি ও অর্থের সঙ্গতি এবং সেই সূত্রেই শব্দচয়নে ধ্বনির প্রতি অভিনিবেশ গদ্যের তুলনায় কবিতায় অনেক প্রকট। সার্থক কবিতায় প্রতিটি শব্দই ঈপ্সিত ভাবপ্রকাশের পক্ষে অপরিহার্য, সেখানে অর্থের বদল না ঘটিয়ে শব্দের বদল কখনই ঘটানো যায় না। এমন কি কোনও শব্দের পরিবর্তে সমার্থক অন্য কোনও শব্দ প্রয়োগ করলেও মূলের তাৎপর্য ও অভিঘাত অভিন্ন থাকে না। আবার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, একক প্রকৃতি ও বিচ্ছিন্ন অর্থের চেয়ে অনেক বেশি জরুরী, তাৎপর্যগর্ভ—শব্দবিন্যাসের নির্দিষ্ট রূপকল্প। একটি বিশেষ প্রসঙ্গসূত্রে বিন্যস্ত হয়েই একটি কবিতার শব্দাবলী একটি অতিরিক্ত আয়তনের সমগ্রতা পায়। তা থেকে চ্ছুরিত হয় আবেগ-অনুভূতি, ভাবানুষঙ্গ, স্বরপ্রকৃতি, অভিপ্রায়, ধ্বনিস্পন্দনের এক অনন্যতা। অনুবাদে মূল কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, বিষয় ও ভাষার সম্পর্ক ভিন্নতা লাভ করে, ধ্বনির বদল ঘটে, শব্দের দ্যোতনা ও অনুষঙ্গ পাল্‌টে যায় এবং সামগ্রিক অভিঘাত অন্য চেহারা নেয়। কবিতার অনুবাদে মূলের ধ্বনিগত অভিঘাতের হানির প্রতি অনেকেই জোর দিয়েছেন। এই ক্ষুন্নতার কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে একটি চিঠিতে ডক্টর শহীদুল্লাহ্-র পদ্যে হাফেজের কবিতা-অনুবাদ সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করতে গিয়ে মহৎ বিদেশী কবিতার অনুবাদ প্রচেষ্টা-মাত্রকেই নিরর্থক মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন: "বিদেশী ভাষার উচ্চশ্রেণীর কাব্যগুলিকে পদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা বর্জ্জনীয় ব'লে আমি মনে করি। কবিতার একদিকে ভাবার্থ, আর একদিকে ধ্বনির ইন্দ্রজাল। ভাবার্থকে ভাষান্তরিত করা চলে কিন্তু ধ্বনির মোহকে এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় কোনমতেই চালান করা যায় না। চেষ্টা করতে গেলে ভাবার্থের প্রতিও জুলুম করতে হয়।"[১০]

কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে আগে থেকেই সর্বতোপ্রয়োজ্য কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা ঠিক চলে না। এক একটি ভাষার এক একটি কবিতা অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সমস্যা উপস্থিত করে, বিশেষ বিশেষ ধরনের নৈপুণ্য দাবী করে। প্রথমতঃ অনুবাদ্য কবিতার ভাষা ও অনূদিত কবিতার ভাষার স্বভাবগত বৈষম্য কি ধরনের এবং কতখানি তার ওপর অনুবাদের সমস্যা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বিশেষজ্ঞেরা বলে থাকেন যে শব্দভাণ্ডার, অন্বয় ও কাব্য-রূপায়ণের দিক দিয়ে জর্মান ও ইংরেজী ভাষার নিকট-আত্মীয়তাই শেক্‌স্‌পীয়রের ইংরেজী কাব্যনাট্যের শ্লেগেল-টিয়েক্ (Schlegel-Tieck)-কৃত জর্মান অনুবাদের

বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা অনেকখানি সম্ভব করে তুলেছে। দ্বিতীয়তঃ একটি ভাষার পেছনে যে জাতীয় জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্রিয়াশীল, তা ঐ ভাষার একটি কবিতার কতখানি গভীরে অনুস্যূত হয়ে আছে তার দ্বারাও ঐ কবিতা-অনুবাদের সমস্যা কি ধরনের তা নির্ধারিত হবে। তৃতীয়তঃ একটি কবিতায় প্রকরণের গুরুত্ব ও বিশিষ্টতা কতখানি তার ওপরও তার অনুবাদ-সমস্যার প্রকৃতি বিশেষভাবেই নির্ভর ক'রে থাকে। অনুবাদককে লক্ষ্য করতে হয়, একটি কবিতা কতখানি বিবৃতি-বা ভাবনা-অবলম্বী, তাতে ইন্দ্রিয়সংবেদ্য চিত্রকল্পের কতখানি ব্যবহার রয়েছে, কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার সামগ্রিক অভিঘাতে শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি-সুভগতার ভূমিকা। একটি কবিতার সামগ্রিক রসাবেদন তার ধ্বনিস্পন্দনের ওপর যত বেশি নির্ভরশীল হবে, ততই তার অনুবাদ দুরূহ হয়ে উঠবে। ভাষায় অননুবাদ্য উপাদান হিসেবে কবিতার যে সংজ্ঞার্থ উপস্থিত করেছিলেন রবার্ট ফ্রষ্ট, তাকে খণ্ডন করতে গিয়ে, ডব্লু. এইচ. অডেন একটি লেখায়[১১] এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, খুব নিবাচিত পাঠকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লেখা কবিতাতেও কিছু উপাদান থেকেই যায়, যা অনুবাদের উপযোগী। শব্দের ধ্বনি, তাদের ছন্দোগত সম্বন্ধ এবং ধ্বনিনির্ভর সমস্ত অর্থ ও অর্থের অনুষঙ্গ, যেমন মিল, শ্লেষ-যমক (Pun)—এদের অনুবাদ অবশ্যই অসম্ভব, কিন্তু সঙ্গীতের মতো কবিতা তো বিশুদ্ধ ধ্বনি নয়। কবিতার যে কোনও উপাদান, যা শাব্দিক অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল নয়, যেমন ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত চিত্রকল্প, উপমা এবং রূপক-অতিশয়োক্তি (metaphor) কিছু পরিমাণে অপর ভাষায় অনুবাদের উপযোগী।

এজরা পাউণ্ড, Melopœia, Phanopœia, এবং Logopœia, কবিতার এই তিনটি প্রকারের কথা ব'লে, তাদের অনুবাদ-সম্ভাবনার ভিন্নতা নির্দেশ করেছেন।[১২] Melopœia-র শব্দগুলি কিছুটা সাঙ্গীতিক লক্ষণাক্রান্ত এবং তার অর্থের প্রকৃতিও ঐ লক্ষণ দ্বারা চালিত। এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় এর অনুবাদ একরকম অসম্ভব, বোধহয় একমাত্র দৈব দুর্ঘটনা ছাড়া এবং তাও একটি সময়ে আধ পঙ্‌ক্তির বেশি নয়। Phanopœia-য় কবি পাঠকের দৃষ্টি-নির্ভর কল্পনার ওপর চিত্রকল্পমালাকে স্থাপন করেন। একে প্রায় বা সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে অনুবাদ করা সম্ভব। Logopœia-তে পাই 'শব্দাবলীর মধ্যে বুদ্ধির নর্তন'। একেও অনুবাদ করা সম্ভব নয়, যদিচ এর মধ্য দিয়ে এর রচয়িতার যে মানসতা প্রকাশ পায় তাকে প্যারাফ্রেজের মধ্যে ধরা যেতে পারে।

কবিতার এই ধরনের কঠোর, অতি-নির্ধারিত বিভাজনে, অবশ্য, কবিতা-অনুবাদের সম্ভাবনা ও সমস্যা-সম্পর্কিত অনুধারন যে বড়োই সরলীকৃত হয়ে পড়ে, তা অস্বীকার করার নয়।

এলিঅট কবিতার যে তিনটি স্বতন্ত্র স্বরের কথা বলেছেন[১৩], অনুবাদে তার প্রথমটির ক্ষেত্রেই সমস্যার জটিলতা বা ক্ষতির সম্ভবনা সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বরের সমস্যার জটিলতা বা ক্ষতির সম্ভাবনা সে তুলনায় অল্পবিস্তর কম। গীতিকবিতা, বলা বাহুল্য, অভিধাটিকে খুব ব্যাপক অর্থেই প্রয়োগ করা হচ্ছে এখানে, যেখানে কবির আত্মগত আবেগ-অনুভূতির উচ্চারণ গাঢ় রক্ত-রেখা এঁকে দিয়ে যায়, তার দ্যোতনা সাধারণভাবে যেহেতু—আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, নীতিমূলক বা প্রচারধর্মী কবিতা বা ব্রাউনীং-এর 'ক্যালিবান্ আপন্ সেটিবস্'-এর মতো ড্রামাটিক মনোলগ, যাতে খুঁজে পাওয়া যায় একটি নির্দিষ্ট কাহিনীসূত্র বা চরিত্রের রেখাঙ্কন বা সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং কাব্যনাট্য, যাতে কবিতাকে রচয়িতার ব্যক্তি-আবেগের প্রতিষ্ঠাভূমি থেকে সরিয়ে এনে স্থাপন করতে হয় চরিত্র ও ঘটনার ক্রিয়াচঞ্চল দ্বন্দ্বমুখর বস্তুমুখীনতার মধ্যে—এদের চেয়ে সংগোপিত, ইশারাময়, অনচ্ছ ও গহন, তাই তার অনুবাদে হারিয়ে যায় মূলের অনেক বেশি ঐশ্বর্য। আর আধুনিক কবিতা সাধারণভাবেই যেহেতু ক্রমশই অধিক ব্যক্তিগত উপলব্ধি-জটিল, প্রতীকী দ্যোতনাময় বা মস্তিষ্ক-নির্ভর হয়ে উঠেছে, তাতে ক্রমশই দেখা দিচ্ছে কবির ব্যক্তিজীবনের গূঢ় অনুষঙ্গ ও উল্লেখ, অবচেতন বা স্বপ্নলোকের আলো-আঁধারি, অধ্যয়নসূত্রে আহৃত প্রত্ন-ইতিহাস, মীথ বা সাহিত্যিক উল্লেখ, তাই তার অনুবাদে নিজস্ব অনুমান, কল্পনা, ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের ওপর অধিক নির্ভর ক'রে অনুবাদককে অনেক বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে হয়। তাতে কাব্যানুবাদের পথ ক্রমশই হয়ে উঠছে বিঘ্নসংকুল ও দুর্গম; কোনও একটি অনুবাদের সাফল্য-অসাফল্য বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনাও অনেক বেড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তবু কবিতার অনুবাদ হয়েই চলে। সেই যে কাব্যানুবাদ দিয়ে অনুবাদের ইতিহাস শুরু হয়েছিল, আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক ক্রীতদাস লিভিয়াস আণ্ড্রোনিকাস হোমারের অডিসি লাতিন পদ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন, তারপর থেকে অব্যাহত ধারায় চলে এসেছে কাব্যানুবাদের সজীব, প্রবল প্রবাহ। এই প্রবাহ রক্ষায় বিনীতভাবে প্রচুর শ্রম, সময়, অভিনিবেশ নিয়োগ করেন কত সৃষ্টিশীল ধ্যানী কবি, বিদগ্ধ সাহিত্যপ্রেমী। ফলতঃ কাব্যানুবাদের সমস্ত প্রতিবন্ধ

বা দুরূহতা স্বীকার করে নিলেও, তার বিরুদ্ধে ধারালো সব যুক্তি সহজেই উপস্থিত করা গেলেও, শেষ পর্যন্ত তার তাৎপর্য ও উপযোগিতা স্বীকার করে নিতেই হয়। কবিতা অনুবাদের এই অসম্ভবতার মধ্যেই রয়েছে সুবিধা—জর্মান ভাষা থেকে কাফ্‌কার রচনা অনুবাদের অভিজ্ঞতা বিবৃতিসূত্রে এডউইন মুইর যেমন বলেছেন।[১৪] আর ভালেরি তাই কবিতাকে অননুবাদ্য ভেবেও আবার ফাদার সাইপ্রিয়ান-কৃত সেণ্ট জন্ অফ্ দি ক্রসের কবিতার ফরাসী অনুবাদের অনুধাবন-সূত্রে কবিতার অনুবাদকেই মনে করেছেন 'শুদ্ধ কবিতা' রচনার নিকটতম বস্তু ব'লে। তাঁর মনে হয়েছিল যেহেতু অনুবাদক অপেক্ষাকৃত কঠোর সীমার মধ্যে এখানে কাজ করেছেন, সেণ্ট জন্ অফ্ দি ক্রসের ভাব, চিত্রকল্প এবং শব্দচয়ন অক্ষুণ্ণ রেখে শুধুই প্রকরণের উদ্‌ভাবনে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, তাই তাঁর কবিতা শুদ্ধ অবস্থায় বা মাধ্যমে রচিত। অর্থাৎ একজন মৌলিক কবিতা-রচয়িতার তুলনায় অনুবাদকের স্বাধীনতা অনেকটা খণ্ডিত ও সীমায়িত বলেই তাঁর প্রয়াসের মূল্য ও তাৎপর্য বেশি। ভালেরি নিজেও ব্যবহার, অভ্যাস ও আনন্দের জন্য কবিতার অনুবাদ করেছেন—ভার্জিলের সম্পূর্ণ একলগ্‌স এবং আরও কিছু কবিতার অনুবাদ।

একটি ভাষার কবিতার নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার বা রক্তাল্পতা দূরীকরণের কাজে বিশেষভাবেই লাগতে পারে ঐ ভাষায় ভিন্ন ভাষার কবিতা-অনুবাদের প্রচেষ্টা। এর ফলে ঐ ভাষার কবিতায় সংযোজিত হতে পারে ভাব ও ভাবনার নতুন পদ্ধতি, বৃদ্ধি পেতে পারে তার দ্যোতনার প্রসার, রূপকল্পের ঐশ্বর্য ও উপস্থাপনের সামর্থ্য। অনুবাদ-প্রয়াসে নিয়োজিত হয়েই এবং অনুবাদ পঠনের অভিজ্ঞতাতেই একটি ভাষার কবিরা তাঁদের ভাষার, তথা তার কবিতার অন্য ভাষার তুলনায় অনুভূতি, চেতনা, অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অভাব, শূন্যতা উপলব্ধি করেন; মূঢ় আত্মতৃপ্তির দেয়াল ধ্বসিয়ে ফেলে তাঁরা হয়ে ওঠেন সৃষ্ট-সম্ভব পরিগ্রহণে উন্মুখ; তাঁদের সমবেত প্রয়াসে তাঁদের ভাষার কাব্যসাহিত্য আত্মানুকরণের জাল ছিড়ে বেরিয়ে এসে নতুন হয়ে ওঠে, আর এইভাবেই তার নিহিত প্রাণশক্তি প্রতিপাদন করে। গিলবার্ট হাইয়েৎ-এর কথা এখানে স্মরণীয়[১৫]: "অনুবাদ সাধারণত মহৎ রচনা সৃষ্টি করে না, কিন্তু প্রায়শই তা মহৎ রচনা সৃষ্টি হতে সাহায্য করে।" চ্যাপম্যান থেকে ক্রিষ্টোফার লোগ্ পর্যন্ত হোমারের মহাকাব্যের যে অনুবাদ প্রচেষ্টা তা পরিব্যাপ্ত হয়ে মিশে গেছে ইংরেজী ও মার্কিন কবিতার চলিষ্ণু প্রবাহে। হোরেস ও কাতুল্লুসের কবিতার

রূপান্তর, ইংরেজী ব্যঙ্গ কবিতা, গার্হস্থ্য গীতিকবিতা ও প্রেমকবিতার ধারায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। জর্মান ধ্রুপদী ও রোমান্টিক কবিতার আত্মপ্রতিষ্ঠার পেছনে প্রবল প্রবর্তনা যুগিয়েছে শেক্‌সপীয়রের রচনার অনুবাদ। বস্তুত ধ্রুপদী কবিতা তো অনুবাদের মধ্য দিয়েই বারেবারে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, বর্তমান ভাবনা ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিকতা এইভাবেই প্রতিপাদিত হয়। তাৎপর্যময় অনুবাদের অভাবেই লুক্রেসিয়াস বর্তমানে ধূসর বিস্মৃতির আড়ালে অনড় হয়ে পড়ে আছেন। শুধু ধ্রুপদী কবিতার প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রেই নয়, আধুনিক কবিতা-আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি ও বিভিন্ন আধুনিক ভাষার কবিতার মধ্যে গূঢ়তর সংযোগের মূলেও রয়েছে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় ব্যাপক কাব্যানুবাদ প্রচেষ্টার সক্রিয় প্রণোদনা। এলিঅট, পাউণ্ড, আপোলিনেয়ার, ভালেরি, রিল্‌কে, মায়াকভস্কি, নেরুদার কবিতার মধ্যে তাই আমরা কবি-মানসতা, আবেগ-অনুভব ও প্রকাশরীতির এক অনতিপ্রচ্ছন্ন যোগসূত্র অনুভব করতে পারি।

অনুবাদক নিজে যদি হন সূক্ষ্ম সংবেদনশীল, সূক্ষ্মক্ষম কবি, তাহলে কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও বোধের ঋদ্ধিসাধনে, এমন কি আত্মোপলব্ধি ও আত্ম-আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে পুরানো কাব্যিক অভিব্যক্তির জীর্ণ গতানুগতিকতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাণবান নতুনকে অঙ্গীকারকরণে বিশেষ সহায়ক হতে পারে তাঁর কাব্যানুবাদের প্রচেষ্টা। বাইরে থেকে কোনো পীড়নে বা অন্য কোনো ব্যাঘাতহেতু বা ভেতর থেকে কোনও শূন্যতার অনুভবে কোনও কবির মৌলিক কাব্যসৃষ্টির স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেলে, একাগ্র, অনলস, অনুবাদ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রেরণার চুল্লী জালিয়ে রাখতে পারেন। তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টিমুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত থাকার জন্য কবির কাব্যপ্রকরণ নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার যে প্রয়োজনের কথা এলিঅট বলেছিলেন এজরা পাউণ্ডের কবিতা আলোচনার সূত্রে,[১৬] তাতে উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পারে কবিতার এই অনুবাদচর্চা। তাই তো সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অনুবাদ-কবিতার সংগ্রহ 'প্রতিধ্বনি'র 'ভূমিকা'র আরম্ভেই যদিচ স্বীকার করেছেন: 'আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব;', তবু প্রায় পরক্ষণেই জানিয়েছেন যে, বাংলা ভাষার 'ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ।' কাব্যানুবাদের গুরুত্ববোধ সম্পর্কে তাঁর মনে কোনও দ্বিধা ছিল না, 'সাময়িক ভালো লাগা থেকে' বিদেশী

কবিতার অনুবাদে 'কর্মপ্রবর্তনা' পেলেও মৌলিক সৃষ্টিসাধনার পরিপূরক হিসেবে এর সবীজ ভূমিকা পরে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর তাই পূর্বোক্ত 'ভূমিকা'য় অত দৃঢ়প্রোথিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন: "...এমন ভাবা ভুল যে উদ্‌ভাবনাশক্তির অভাববশতই আমি এই পরকীয় লেখাগুলোর পিছনে এত সময় কাটাতে পেরেছি। কারণ উক্ত পরিশ্রম আসলে অপচয় নয়; এবং অনুবাদে বৈশিষ্ট্যের অবকাশ যতই থাক না কেন, তার সুপরিমিত সীমা যেহেতু স্বেচ্ছাচারের পরিপন্থী, তাই তার চর্চা স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর। অন্ততপক্ষে আমাকে অনুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে-সুযোগ দিয়েছে, নিজের বক্তব্যে তার অর্ধেকও মেলেনি; এবং সেইজন্যে যে-উদ্যমের প্রস্তাবনা কিছুক ভালো লাগায়, তার পরিণতি দুরূহের দারুণ আকর্ষণে।"

'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতাগুলি রচনার সময় থেকে প্রায় ধারাবাহিকভাবে কাব্যানুবাদপ্রয়াসে নিয়োজিত হয়ে থেকেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর কবিতাগুলির রচনাকাল: ১৯৫৪-১৯৫৮। ১৯৫৫-য় 'কবিতা' পত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কবিতার সংকলন 'প্রতিধ্বনি'-র তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণসূত্রে বুদ্ধদেব কবিতা-অনুবাদের স্বরূপ, তাৎপর্য, উপযোগিতা, লক্ষ্য, অনুবাদের সঙ্গে অনুবাদকের সম্পর্ক, মৌলিক কবিতাসৃষ্টিতে অনুবাদচর্চার উপকারী সহযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর গভীর অনতিসংক্ষিপ্ত ভাবনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 'কবিতা ও আমার জীবন আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ', শীর্ষক দ্যুতিমান রচনায় বেশ স্পষ্ট প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠেই তিনি আমাদের জানিয়েছেন: "আমি অন্তত অনুবাদকে দুধের বদলে ঘোল ব'লে ভাবতে পারি না; আমার মনে হয় সেটাও একটা সৃষ্টিকর্ম; তারও জন্য চাই প্রেরণা, যার উৎপত্তিস্থল মূল কবির প্রতি প্রেম আর কখনো বা তাঁর সঙ্গে একাত্মবোধ; তাতেও আছে সেই আনন্দ যা সত্যিকার নিজস্ব কিছু লেখার সময় প্রাপ্ত হই আমরা; আর সেটাও বিস্তর খাটিয়ে নেয় আমাদের, ব্যবহার করে আমাদের সব বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিনিবেশ।"[১৭] এবং "আজকের দিনে রচনাকর্মকে আমি যে-ভাবে দেখি এবং চিন্তা করি, যে-সব সমস্যা তা উপস্থিত করে এবং যে-ভাবে তার সমাধানের পথ খুঁজে পাই; যে-ভাবে, ধরা যাক, আমার সাম্প্রতিক কবিতা ও গদ্য-কবিতা ও কাব্যনাট্য, এমনকি কোনো-কোনো গদ্যরচনা আমি লিখেছিলাম, তার মধ্যে কতখানি আমার অনুবাদকর্মের অবদান আছে, আমি তা মনে-মনে ভালোই জানি।"[১৮]

'যে-আঁধার আলোর অধিক' বুদ্ধদেবের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ, তাঁরই

ভাষায় তা তাঁর 'জীবনের এক সন্ধিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে।'[১৯] এই কাব্যগ্রন্থের ভাববস্তুতে বোদলেয়ার ও রিল্‌কে এবং রূপকলায় বোদলেয়ার ছায়া ফেলে গেছেন।

তবু যদি মনে হয় ভুল
নীলিমায় নিজেরে মিলাও,
মুছে যাক ব্যবহার্য নাম;
হাওয়ার আনন্দে ব'য়ে যাও
তারার রুপালি অন্ধকারে;

—'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর' কাব্যগ্রন্থের 'চল্লিশের পরে' কবিতাটির এই অংশের পাশাপাশি যদি আমরা—

প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।
ওরা তোকে কেবল ভোলাতে চায়—ঘাস, মাটি, পুকুর, আকাশ
ফেলে দে পুতুল, ফুল, পোষা পাখি, শৌখিন ক্যাকটাস;
ডুবে যা নিরভিমান, একতাল, বিশ্বস্ত নির্বেদে।

—'যে-আধার আলোর অধিক'-এর 'আটচল্লিশের শীতের জন্য: ২' কবিতার এই অংশটুকু রাখি, তাহলেই আমরা বুঝে নিতে পারব 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এর ভাববস্তুতে বোদলেয়ারের অমোঘ সংক্রাম। পল দেমনিকে লেখা বিখ্যাত 'দ্রষ্টার চিঠি'-তে 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা, সত্যিকারের এক দেবতা' ব'লে বোদলেয়ারকে আবিষ্ট বিনতি জানিয়েও আর্তুর র‍্যাঁবো বোদলেয়ার সম্পর্কে সেইসঙ্গে বলতে ভোলেন নি: 'তবু তিনি বড়ো পরিশীলিত আবেষ্টনে জীবন কাটিয়েছেন; এবং তাঁর অতি-প্রশংসিত প্রকরণ অকিঞ্চিৎকর; অজানার আবিষ্কার নতুন প্রকরণ দাবী করে।' বুদ্ধদেব কিন্তু বোদলেয়ারের এই কাব্য-প্রকরণ সম্পর্কেও শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। 'শার্ল বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় তাই তিনি বোদলেয়ারের 'ছন্দোবন্ধের দার্ঢ্য, মিলের বিস্ময় ও পর্যাপ্তি, নিয়মনিষ্ঠ সনেটের প্রতি অমর আসক্তি'—এই সব 'নির্ভুলভাবে ক্লাসিক লক্ষণ'-এর কথা বেশ জোর দিয়েই উল্লেখ করেছেন। 'যে-আঁধার আলোর অধিক'-এ সনেট বা সনেটকল্প কবিতাই বেশি। এদের সংক্ষিপ্ত, পরিমিত গঠন, আঁটো বাঁধুনি, ঘনসংহত শব্দবিন্যাসের পেছনে বুদ্ধদেবের কবিস্বভাবের স্বাভাবিক উন্মুখতা, ধৈর্যশীল প্রয়াস, সুধীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়াও বোদলেয়ারের

কবিতার রূপকলার প্রতি বুদ্ধদেবের সশ্রদ্ধ আকর্ষণও প্রেরক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা, যে দিন পার্ক স্ট্রীটের এক বইয়ের দোকানে হঠাৎ দেখতে পাওয়া জ্যাকেটের ওপর বিরাট অক্ষরে 'BAUDELAIRE'-নামাঙ্কিত একটি রোগা বইয়ের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেবের কবি-জীবনে বোদলেয়ারের প্রবল তাৎপর্যময় অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। সেদিন ফিরতি ভিড়-ট্রামের মধ্যেই বইটির সরল ও আক্ষরিক অনুবাদের আস্বাদ নেবার সময় ফরাসী ভাষায় তাঁর অনভিজ্ঞতা ও ইংরেজ অনুবাদকের শিল্পহীনতা অতিক্রম ক'রে বোদলেয়ার তাঁর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের নিজের ভাষায়: 'যেন এই কবিরই অপেক্ষায় আমি ছিলাম এতদিন, যেন আমি নিজের অজান্তে এ-মুহূর্তে যা প্রার্থনা করছিলাম, এই কবিতাগুলি ঠিক তাই।'[২০] উত্তরজীবনে বোদলেয়ার, হেল্ডার্লিন, রিল্‌কে—প্রতীচ্যের এই তিন মহৎ কবির কবিতার ও কালিদাসের মেঘদূতের যে নিবিষ্ট অনুবাদপ্রয়াস বুদ্ধদেব করেছিলেন, তার ফলেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন: 'যতক্ষণ আমরা কানে-কানে ধনুকের ছিলা না-টানছি ততক্ষণ আমরা আমাদের ক্ষমতার সীমা জানতে পারি না—লেখকের জীবনে ধৈর্য ও পরিশ্রমই সব।'[২১]

কবিতার অনুবাদ পঠন ও তার চর্চা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যশিল্পের নবরূপায়ণেও সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

'রাম রাম—
একটু তেল চাই কামানের চাকায়।'

দিয়ে
বহালতবিয়তে থাকলেন নিজাম।
এখন বজ্জাতগুলোকে টিট করা দরকার
চাই খুব জবরদস্ত এক
বন্দুক সরকার,
মন্ত্রী হোন জল্লাদ—
তারপর দেখা যাক জমির আস্বাদ
ভোলে কি ভোলে না
অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা।

('রাম রাম', 'অগ্নিকোণ')

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ'-এর একেবারে শেষ কবিতার এই প্রচার-টীৎকৃত সাংবাদিক বিবৃতি, আর একই কবির—

অন্ধকারের চোখ জ্বলে,
চোখে আগুন। ('মা, তুমি কাঁদো')
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত ('ফুল ফুটুক না ফুটুক')

—এমন স্পন্দিত উচ্চারণের মাঝখানে এক তাৎপর্যময় বিভাজনরেখার মতো দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁর 'নাজিম হিকমতের কবিতা'-র অনুবাদগুলো। এদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এক সংগ্রামী হৃদয়ের আন্তরিক উত্তেজনা, স্বপ্ন, আশা, প্রেম, সঙ্কল্প যা প্রধানত ইংরেজী অনুবাদ এবং কিছুটা ফরাসী অনুবাদের মধ্য দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার নিভন্ত চুল্লীকে তীব্রভাবে উস্‌কে দিতে পেরেছিল। এরই ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবার সত্যিকারের কবিতা, সত্যিকারের নতুন কবিতা, লিখতে পারলেন যা সংগ্রামের স্বপ্ন ও সংকল্প, মানুষের প্রতি বুকভরা ভালোবাসার প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণে প্রাণময়।

কবিতার অনুবাদ এক হিসেবে কবিতার আস্বাদনে ও বিচারেও সাহায্য করে। অনুবাদের বিচ্যুতি, অপূর্ণতাই, কোনো কোনো সময়ে অনুবাদ্য কবিতার অনন্য মহিমাকে আলোকিত করে দেয়, অনুবাদক-কবির শিল্পকৌশলের শক্তি ও দুর্বলতাকে উদ্‌ঘাটন করে। আবার আর একদিক দিয়েও কবিতার অনুবাদকে কবিতার সমালোচনারূপে নির্দেশ করা যায়। অন্য এক যুগের অন্য এক ভাষার কবিতার কতটুকু আর একটি যুগের আর একটি ভাষার কবিতার পক্ষে প্রাসঙ্গিক, কবিতার অনুবাদে সে সম্পর্কিত প্রাতিস্বিক অনুধাবন অনুবাদক ধরে দেন। যেমন এইচ. এ. ম্যাসনের মতে, এলিঅট সেনেকার যতখানি তাঁর সমকালে সজীব করে তুলতে পারবেন, ততখানি অনুবাদ ক'রে তাঁর 'মুইনি অ্যাগনিষ্টেস'-এর টুকরোগুলোয় সন্নিবেশ করেছেন। এই সূত্রেই ম্যাসন অনুবাদকে বলেছেন, সমালোচনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।[২২]

রোমান য়াকবসন শাব্দিক সঙ্কেত ব্যাখ্যার তিনটি পৃথক উপায়ের কথা চিন্তা ক'রে অনুবাদের তিনটি প্রকারের কথা বলেছেন[২৩]: (১) ইন্ট্রালিঙ্গুয়াল ট্রানস্লেশন্ অর্থাৎ রিওয়ার্ডিং হচ্ছে একটি ভাষার শাব্দিক সঙ্কেতের ঐ একই ভাষার অন্য শাব্দিক সঙ্কেত দ্বারা ব্যাখ্যা; (২) ইন্টারলিঙ্গুয়াল ট্রানস্লেশন্ অর্থাৎ ট্রানস্লেশন্

প্রপার হচ্ছে একটি ভাষার শাব্দিক সঙ্কেতের অন্য ভাষার শাব্দিক সঙ্কেত দ্বারা ব্যাখ্যা ; (৩) ইণ্টারসেমিওটিক ট্রান্স্লেশন্ অর্থাৎ ট্রান্সমিউটেশন্ হচ্ছে শাব্দিক সঙ্কেতের অশাব্দিক সঙ্কেতপদ্ধতির সঙ্কেত দ্বারা ব্যাখ্যা। কবিতার অনুবাদ সম্পর্কে যে কোনও আলোচনায় এগোলে, অবশ্যই দ্বিতীয় প্রকারের অনুবাদ, নানা সমস্যা, অভিপ্রায় ও আদর্শের অনুধাবনে, আলোচকের প্রায় সবটুকু মনোযোগই অধিকার করে নেবে। তবু এজরা পাউণ্ডের 'দি সিফেয়ারার'-এর বহুল-আলোচিত দৃষ্টান্তটি মনে রাখলে এক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের অনুবাদপ্রয়াস-গুলিকেও কখনও উপেক্ষা করা যায় না।

কবিতার অনুবাদ-প্রচেষ্টায় চরিতার্থ হতে হলে মগ্নতার বড়োই প্রয়োজন। এ কাজে তন্নিষ্ঠ অভিনিবেশ না থাকলে কি ক'রে সঞ্চারিত হবে একটি স্থির অভিপ্রায়ের বোধ যা অনুবাদকে একটি সামগ্রিক তাৎপর্য দানের পক্ষে বিশেষ জরুরী? এরই সঙ্গে সঙ্গে তো স্ফূর্ত হবে অন্য সব প্রয়োজনীয় গুণ: শ্রমনিষ্ঠা, বিনয়নম্রতা, আত্মমর্যাদাবোধ, সহানুভূতি ও সশ্রদ্ধ অনুরাগ, অন্তর্দৃষ্টি, অনুবাদ্য কবিতার ভাষায় জ্ঞান ও অনূদিত কবিতার ভাষায় নৈপুণ্য অর্জনের তাগিদ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা-অনুবাদপ্রয়াস যে বহুলাংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাঁর কবিতা-অনুবাদ পরিমাণে যতখানি বিপুল, সে অনুপাতে শিল্পসিদ্ধির দিক দিয়ে যে অনুল্লেখ্য, তার প্রধান কারণই ছিল তাঁর মধ্যে মগ্নতা, সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায় ও সুস্থির রুচির অভাব। কোনও প্রয়োজনবোধ বা তাৎপর্যভাবনা তাঁকে এই কাজে প্রেরিত করে নি, নির্বিচার অভিনবত্বলোলুপতাই তাঁকে তাড়না করে ফিরেছিল। 'তীর্থরেণু'-র পরিচিতি হিসেবে সন্নিবিষ্ট প্রারম্ভিক কবিতাটিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নিজের অজান্তেই তাঁর এলোমেলো নির্বিচার নির্বাচনে উদ্ঘাটিত চিন্তাবিরহিত অপরিণত বিস্ময়বোধের কথা কবুল ক'রে গেছেন:

> 'খুঁজি না, বাছি না, বুঝি না, কেবল
> চেয়ে থাকি অনিমেষে।'

তাই 'তীর্থসলিল'-এ ব্লেক, সুইনবার্ন, টেনিসন, ভিক্তর হ্যুগো, হোমর, বাল্মীকি, ভার্জিল, শেলি, গ্যেটে, শেক্সপীয়র, কালিদাস, সাফো, ভবভূতি, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, হাফেজ, গতিয়ে, কীট্স, দান্তে, পেত্রার্ক, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবির কবিতা-অনুবাদের পাশেই স্থান পেয়েছে মাউরি জাতির 'ঘুম-পাড়ানি', জাপানী 'ঘুম-পাড়ানি', হাবসী নারীর গান, বেলুচির গান, মুমূর্ষু তাতার সিপাহীর গান, নেপালী শ্লোক ইত্যাদির অনুবাদ। 'তীর্থরেণু'-তে সংকলিত হয়েছে তরু

দত্ত, লেকঁৎ দ্য লিল, পল্ ভার্লেন, তু-ফু, বোদলেয়ার, পাউণ্ড, লি-পো, ল্যাণ্ডর, দে ম্যুসে, ক্রিষ্টিনা রসেটি, শিলার প্রভৃতির কবিতা-অনুবাদের পাশেই তেলেগু ও তামিল ছড়া, কসাক্ ঘুমপাড়ানী গান, মুণ্ডারি কবিতা, মেক্সিকোর নৃত্য-গীতিকা, ব্রাহুই গান, আইসল্যাণ্ডের রণচণ্ডীর গান, নিশানের মর্যাদা (নান্সান্ যুদ্ধের পর একজন মৃত জাপানী সৈনিকের পাগড়ীর মধ্যে প্রাপ্ত) ইত্যাদির অনুবাদ। শেষোক্ত 'কবিতাটি' অর্থাৎ 'নান্সান্ যুদ্ধের পর একজন মৃত জাপানী সৈনিকের পাগড়ীর মধ্যে প্রাপ্ত' 'নিশানের মর্যাদা' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা ভাষান্তরে দাঁড়িয়েছে এইরকম:

> 'প্রভু! নিশি অবসানে শিশিরের সনে
> হয়ত জীবন ফুরাবে প্রাতে,
> তবু নিশানের মান রক্ষা করিব,—
> দিব না সে ধন শত্রু হাতে;
> কভু ছাড়িব না তাহা; অন্তিমে তারে
> পাগড়ী করিয়া বাঁধিব মাথে।'

—এ ধরনের অনুবাদপ্রয়াসে সময় ও শক্তির অপচয় ছাড়া আর কোন্ বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হয়?

যথার্থ সার্থক কবিতা-অনুবাদে চাই বোধি ও বুদ্ধির ফলদ সখ্য, বিশ্লেষণী মনন ও সৃষ্টিদীপ্ত কল্পনার নিরন্তর সংযোগ। যে ভাষার কবিতা অনুবাদক অনুবাদ করবেন—তার শব্দার্থ, বাগ্ধারা, ধ্বনির বিশিষ্ট স্বভাব, সঙ্গীতধর্ম সম্পর্কে অন্তর্ভেদী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁকে অর্জন করে নিতে হবে। কবিতা-অনুবাদে এই মূল ভাষাজ্ঞানের গুরুত্ব কোনোমতেই হ্রাস করা চলে না। দুঃখের বিষয় এ সম্পর্কে যথোচিত চেতনার অভাব কোনও কোনও মগ্ন অনুবাদ-প্রয়াসীর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। উত্তরজীবনে বোদলেয়ার, হোল্ডার্লিন, রিল্কে, প্রতীচ্যের এই তিন মহৎ কবির কবিতার ও কালিদাসের মেঘদূতের যে অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়, একাগ্র অভিনিবেশ, বিনীত সশ্রদ্ধ শ্রম, সর্বোপরি ধ্যান, প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলেও, বোদলেয়ারের কবিতা-অনুবাদ প্রসঙ্গে ফরাসী ভাষায় তাঁর নিজের অনভিজ্ঞতাকে লঘু করে দেখাতে গিয়ে, তিনি যে হঠোক্তি করেছেন, তা বিশেষ পরিতাপজনক। ফরাসী বা হিস্পানী ভাষা থেকে যিনি ইংরেজীতে কবিতা-অনুবাদে প্রবৃত্ত হবেন তাঁকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে বিভ্রমাত্মক প্রতিষঙ্গ (illusory correspondence) বা প্রতারক

সাদৃশ্যের (deceptive resemblance) চোরা ফাঁদ সম্পর্কে। তিনি জানবেন ফরাসী brave-এর অর্থ ইংরেজী brave নয়, honnête-এর মানে honest নয়, joli বললে jolly বোঝায় না, আবার হিস্পানী actual-এর অর্থ ইংরেজী contemporary, justification-এর মানে হতে পারে an apology, Lechería বলতে dairy বোঝায়, brothel নয়। এ ধরনের দৃষ্টান্ত ফরাসীতেই খুব বেশী, জর্মান ভাষায় বিরল। ফলে ফরাসী ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের তুলনায় জর্মান ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদে ভাষাগত ভ্রান্তির ঝুঁকি কম। বলাই বাহুল্য ইংরেজী বা প্রতীচ্যের অন্য কোনও ভাষা থেকে বাংলায় কবিতা-অনুবাদে এই ধরনের সমস্যা দেখা দেবার কথা নয়, যেহেতু সেখানে মূল ও অনুবাদের দুটি ভাষার মধ্যে উৎপত্তিগত সূত্র ধরে কোনও আপাত-নিকট সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। মূল কবিতার ভাষায় সাধারণভাবে অধিকার অর্জন করলেই কার্যসিদ্ধি হয় না, যে কবির কবিতা অনূদিত হচ্ছে তার বিশিষ্ট ভাষা-প্রয়োগ পদ্ধতি, এমন কি অনেক সময়ে তার কোনও একটি সৃষ্টিপর্যায়ে বা কাব্যগ্রন্থে ভাষা ব্যবহারের বিশেষ সূক্ষ্মতা বা জটিলতা এবং তা থেকে উদ্‌গত ধ্বনি ও স্বরভঙ্গীর সুরবৈচিত্র্য অনুধাবন করারও প্রয়োজন দেখা দেয়। এক একজন কবির রচনার অনন্যতা তাঁর প্রকরণের এক বা একাধিক উপাদানের মধ্যে প্রায়শই নিহিত থাকে। যেমন রিল্‌কের ইংরেজী অনুবাদক জে. বি. লীশমান জানিয়েছেন, যদিচ রিল্‌কের কবিতায় উপমা খুব বড়ো ভূমিকা নেয়, এবং বোধহয় আর কোনও মহৎ কবি এতো বেশি 'মতো' ব্যবহার করে নি, তবু তাঁর ধারণা রিল্‌কের কবিতার গহনতম রহস্য তার চিত্রকল্পে নিহিত নেই, রয়েছে তার অন্বয়ে এবং ছন্দঃস্পন্দে।[২৩] যে ভাষায় অনুবাদ করবেন অনুবাদক, সৃষ্টিক্ষম রচনানৈপুণ্যের সঙ্গে তাকে ব্যবহার করতে জানবেন তিনি। এই জন্যেই ঐ ভাষা তাঁর মাতৃভাষা হওয়া কাঙ্ক্ষিত। পোলি কবি CZESLAW MILOSZ-কে অবশ্যই এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বলে ধরতে হবে। মূল কবিতার ভাষায় সমুচিত ব্যুৎপত্তি ও অনূদিত কবিতার ভাষায় উপযোগী সৃষ্টিকুশলতা একই ব্যক্তির মধ্যে সমন্বিত হওয়া যথেষ্ট কঠিন বলেই পাশ্চাত্য দেশে সম্প্রতি একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক সহযোগিতায় একটি অনুবাদকর্ম নিষ্পন্ন করে তোলার রেওয়াজ বেশ দেখা দিয়েছে। একজন থাকেন মূল ভাষায় বিশেষজ্ঞ, তিনি হয়তো মূল কবিতাটির একটি আক্ষরিক অনুবাদের খসড়া তৈরি করে দেন; অপরজন অনুবাদের ভাষায় সৃষ্টিশীল কবি, তিনি ঐ খসড়া থেকে সৃষ্ট ক'রে তোলেন একটি

সজীব, শিল্পসফল কবিতা। এ ধরনের যুক্ত অনুবাদপ্রয়াসের একটি উল্লেখ্য উদাহরণঃ রবার্ট গ্রেভ্‌স্ ও ওমর আলি শাহ্‌-কর্তৃক অনূদিত 'দি রুবাইয়াৎ অফ্ ওমর খৈয়াম্' (ক্যাসেল, ১৯৬৭)। আবার বোর্হেসের হিস্পানী ভাষায় লেখা নির্বাচিত কবিতাবলীর একটি ইংরেজী অনুবাদ-সংকলন প্রস্তুত করবার ব্যাপারে অনেক সময়ই তিনজন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়ঃ একসঙ্গে হাত মেলান—ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সদা-তৎপর, ইংরেজী ভাষায় ব্যাপক অধিকারসম্পন্ন স্বয়ং কবি বোর্হেস, দুই ভাষাতেই ব্যুৎপন্ন সম্পাদক নর্মান টমাস ডি গিওভানি, এবং অ্যালাস্টেয়ার রিড বা রবার্ট ফিট্‌জেরাল্ড বা বেন্ বেলিট্‌-এর মতো ইংরেজী ভাষায় একজন সৃষ্টিশীল কবি।[২৪]

যে কবির কবিতা অনুবাদ করবেন অনুবাদক, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানসতার প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং তাঁর সৃষ্টিশক্তি তথা তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। তাই ঐ কবির দীর্ঘ সাহচর্যে তাঁর সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপন ক'রে, তাঁর সৃষ্টির মর্মলোকে প্রবেশের সামর্থ্য অনুবাদককে অর্জন করে নিতে হয়। মূল কবিতার কবির সঙ্গে অনুবাদকের মানসিক সংযোগ স্থাপিত হতে না পারলে অসামান্য কুশলী কাব্যশিল্পীর হাতেও অনুবাদ কেমন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, তার প্রণিধানযোগ্য নিদর্শন মেলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত ডি. এইচ. লরেন্সের 'অন্ দি ব্যাল্‌কনি'-র অনুবাদ 'কালতরী'-তে[২৫]। সেখানে—'গম্ভীর গিরির ভালে ক্ষীণ ইন্দ্রধনুর তিলক—/এ-পারে তুমি ও আমি—ব্যবধান দম্ভোলিপ্রহত—/ অবরোহী পাদদেশে ছত্রভঙ্গ শ্রমিকের দল, / অসিত স্থাণুর মতো, বদ্ধমূল সবুজ গোধূমে॥'—সুধীন্দ্রনাথের এইরকম গম্ভীর তৎসম শব্দের শোভাযাত্রায় মূল কবিতায় প্রকাশিত লরেন্সের সহজ প্রায়-কথ্য স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। অথচ এটা যে মোটেই সুধীন্দ্রনাথের উপযোগী ভাষাপ্রয়োগের অক্ষমতা-প্রসূত নয় তার সাক্ষ্য মেলে, হাইন্‌রিখ্ হাইনের Unvollkommenheit কবিতার অনুবাদ 'পরিবাদ'-এ 'কোণারকের সুন্দরীদের পাছা বেজায় ভারী। বাঙালীদের নাকের আবার নেই কো বাড়াবাড়ি।'—সুধীন্দ্রনাথের এই ধরনের আটপৌরে ভাষাপ্রয়োগের অনায়াস দক্ষতায়।[২৬] আবার, দীর্ঘ সহবাসের ফলে বোদলেয়ারের কবিতা, ব্যক্তিত্ব ও জীবনের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ঘনিষ্ঠতা গভীর হয়ে উঠতে পেরেছিল বলেই, বোদলেয়ারের মধ্যে তিনি আপন চিন্তা, কল্পনা ও অন্বেষণকে চিনে নিতে পেরেছিলেন বলেই, তাঁর বোদলেয়ারের কবিতা-অনুবাদ নানা দুর্বলতা ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও হয়ে উঠেছে তীব্র তাৎপর্যময় ও সংক্রামক। এই

অন্তরঙ্গ ও গভীর সংযোগ ছাড়া, উদ্দিষ্ট কবি ও তাঁর কবিতা সম্বন্ধে অনুবাদক কখনই সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সমর্থ হবেন না, যার দাক্ষিণ্যে তিনি ছুঁতে পারবেন, অনুবাদ্য কবিতার সংগোপিত দ্যোতনাকে, তার বাচ্যাতীত ইঙ্গিতকে। এই সূত্রে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে—বোদলেয়ারের Tableaux parisiens-এর অনুবাদের পরিচায়ন-প্রসঙ্গে একটি বিদ্যুৎ-চকিত সগর্ভ উক্তি করেছিলেন ওয়াল্টার বেঞ্জামিন: 'সমস্ত মহৎ রচনাই তাদের পঙ্‌ক্তিগুলির ফাঁকে ফাঁকে তাদের সম্ভাব্য অনুবাদকে কিছুটা ধরে রাখে।'[২৭]

কবিতা-অনুবাদের কোনও সর্ববাদীসম্মত বা সর্বজনগৃহীত আদর্শ নেই। এ সম্পর্কে যে তীব্র মতবৈষম্য রয়েছে তা নির্দেশ করার জন্য অনুবাদের শিল্প-বিষয়ক একটি আলোচনাগ্রন্থে, ছটি বৈপরীত্য-সূচক যুগ্মে এইভাবে পরপর বারোটি বাক্য সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে:[২৮]

১। একটি অনুবাদ মূলের শব্দগুলিকে অবশ্যই উপস্থিত করবে।
২। একটি অনুবাদ মূলের ভাবসমূহকে অবশ্যই উপস্থিত করবে।
৩। একটি অনুবাদ একটি মৌলিক রচনার মতো পঠনীয় হবে।
৪। একটি অনুবাদ একটি অনুবাদের মতো পঠনীয় হবে।
৫। একটি অনুবাদের প্রতিফলিত করা উচিত মূলের রচনারীতি।
৬। একটি অনুবাদের অবলম্বন করা উচিত অনুবাদকের রচনারীতি।
৭। একটি অনুবাদ মূলের সমকালীন রচনারূপে পঠনীয় হবে।
৮। একটি অনুবাদ অনুবাদকের সমকালীন রচনারূপে পঠনীয় হবে।
৯। একটি অনুবাদ মূলের সঙ্গে সংযোজন বা মূল থেকে বর্জন করতে পারে।
১০। একটি অনুবাদ কখনই মূলের সঙ্গে সংযোজন বা মূল থেকে বর্জন করতে পারবে না।
১১। একটি পদ্যের অনুবাদ গদ্যে হওয়া উচিত।
১২। একটি পদ্যের অনুবাদ পদ্যে হওয়া উচিত।

—এই বৈপরীত্যের একপ্রান্তে, মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা, অন্যপ্রান্তে অনুবাদকের স্বাধীনতা; একদিকে একটি ভিন্নভাষার কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণের বিচিত্র রূপ-কল্প ও মেজাজের যথাসম্ভব সন্নিহিত হওয়ার দায়, অন্যদিকে অনুবাদকর্মটিকে স্বভাষায় একটি মৌলিক কবিতার মতোই স্বতন্ত্র প্রাণসত্তা, উপভোগ্যতা ও শিল্প-সিদ্ধি দানের অভীপ্সা; একদিকে আত্মঅস্বীকৃতি, অন্যদিকে আত্মমুখিতা। অনুবাদের আদর্শ ও পদ্ধতির দিক দিয়ে এই দুই বিপরীত প্রবণতাসম্পন্ন অনুবাদকদের, ধ্রুপদী গ্রীক সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদের ক্ষেত্রে, দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে: (১) হেলেনাইজার্‌স্ (২) মডার্নিষ্টস্ (মডার্নাইজার্‌স্?)।[২৯] হেলেনাইজারদের লক্ষ্য, মূল গ্রীক সাহিত্যের অর্থ এবং বিশিষ্ট বাগ্‌ধারার প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে তার প্রাচীনত্বের বৈশিষ্ট্যটুকু যথাসম্ভব রক্ষা। মডার্নিষ্ট বা মডার্নাইজারদের লক্ষ্য, মূলের সঙ্গে কিছুটা তুল্যতা রক্ষা করে অনুবাদের ভাষার অর্থাৎ ইংরেজীর নিজস্ব প্রাণধর্ম, বাগ্‌ধারার প্রতি মুখ্য অভিনিবেশ দেওয়া।

অনুবাদে সততা ও শিল্পসৌন্দর্যসৃষ্টির চিরন্তন বিরোধ প্রতিপাদন করতে গিয়ে ক্রোচে যে কুরূপা সতী (faithful ugliness) এবং সুরূপা অসতীর (faithless beauty) প্রবাদখ্যাত বিভেদ-কথন স্মরণ করেছিলেন[৩০] তার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেওয়া যায় না। একটি শিল্পকর্মের নান্দনিক বিচারে বিশ্বস্ততার ধারণা সৌন্দর্যের উপলব্ধির সঙ্গেই অন্বিত; সুন্দরের সৃষ্টিই সেখানে বিশ্বস্ততা, অসুন্দরের উদ্‌ঘাটনই সেখানে অবিশ্বস্ততা। ইংরেজী ভাষায় পুশ্‌কিনের কাব্যোপন্যাস ইউজিন ওনেগিনের অনুবাদ-সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে ভল্‌াডিমির নবোকভ কবিতার অনুবাদে পরিপূর্ণ যথাযথতা ও অর্থের সম্পূর্ণতাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দান ক'রে যে জানিয়েছিলেন: 'দি ক্লামসিয়েস্ট লিটারাল ট্রান্সলেশন ইজ্ এ থাউজেণ্ড টাইম্‌স্ মোর ইউজফুল দ্যান্ দি প্রিটিয়েস্ট প্যারাফ্রেজ'[৩১]—'সবচেয়ে বেঢপ আক্ষরিক অনুবাদ সবচেয়ে সুন্দর ভাবব্যাখ্যানের চেয়ে হাজার গুণ বেশি কার্যকর' —তার মধ্যে 'ইউজফুল' শব্দটিই লক্ষ্য করবার মতো। প্রয়োজনসিদ্ধির এই দৃষ্টিকোণের সঙ্গে নান্দনিক দৃষ্টিকোণ, বলাই বাহুল্য, একেবারে মেলে না এবং কবিতা-অনুবাদের শিল্প-সার্থকতা বিচারে এই উপযোগ-বিবেচনা অবশ্যই অবান্তর। ফলতঃ কবিতা-অনুবাদের লক্ষ্য ও আদর্শ অনুধাবনে, অনুবাদে 'একটি ভালো কবিতাকে খারাপ কবিতায় পরিণত করা হবে না'—রসেটির এই নির্দেশটিকে অন্ততঃ আমরা তর্কাতীত ব'লে মান্য করে নিতে পারি।

কবিতা-অনুবাদের আধুনিক যুগে অনুবাদকের উপলব্ধি ও উদ্‌ভাবনের স্বাধীনতা, অনুবাদে তাঁর ব্যক্তিসত্তার অনুপ্রবেশ-অধিকার এবং অনুবাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য অনেক বেশি স্বীকৃতি পেয়েছে। ড্রাইডেন তিন প্রকারের অনুবাদের কথা বলেছিলেন:[৩২] (১) মেটাফ্রেজ—শব্দ ধ'রে ধ'রে, পঙ্‌ক্তি ধ'রে ধ'রে এতে অনুবাদ করা হয়; (২) প্যারাফ্রেজ—এতে শব্দাবলী ততটা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না, যতটা হয় অর্থ, যা সম্প্রসারিত করা চলতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত

করা চলবে না; (৩) ইমিটেশন—এতে অনুবাদক মূলের শব্দ ও অর্থ থেকে সরে আসার স্বাধীনতাই শুধু নেন না, প্রয়োজনমতো তাদের উভয়কে পরিহারও করেন; এবং মূল থেকে শুধু কিছু সাধারণ ইঙ্গিতমাত্র নিয়ে, তার ভিত্তিতে নিজের ইচ্ছামতো নূতন রূপনির্মাণ করেন। ড্রাইডেন জানিয়েছেন যে এই ইমিটেশন হয়তো একেবারেই অনুবাদ নয় এবং এই ধরনের অনুবাদচর্চা সবচেয়ে বড়ো অন্যায় যা মৃতের স্মৃতি ও খ্যাতির প্রতি সংঘটিত হতে পারে। মজার ব্যাপার, একালের একজন অগ্রণী কবি-অনুবাদক রবার্ট লোয়েল এই 'ইমিটেশন' শব্দটিকেই সাগ্রহে তুলে নিয়ে তাঁর অনুবাদ-কবিতা-সংকলনের আখ্যা দিলেন 'ইমিটেশন্‌স্'। বইটির মুখবন্ধে অনুবাদক হিসেবে তাঁর লক্ষ্য বিবৃত করতে গিয়ে লোয়েল লিখেছেন: "আমি আক্ষরিক অর্থের ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়েছি এবং স্বরপ্রকৃতিটি আয়ত্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করেছি।...আমি চেষ্টা করেছি জীবন্ত ইংরেজী লিখতে এবং আমার মূল রচয়িতারা এখন আমেরিকায় বসে তাঁদের কবিতাগুলি লিখলে সম্ভবত যা করতেন আমি তাই করেছি।" লোয়েল নিজেই জানিয়েছেন যে তিনি র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী' অনুবাদ করতে গিয়ে তার এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিয়েছেন—তাঁর ভাষায় এই প্রক্রিয়ার নাম 'আনক্লটিং'। রিল্‌কের কবিতা-অনুবাদ করতে গিয়ে লোয়েল আবার তার সঙ্গে স্বরচিত কবিতার স্তবক জুড়ে দিয়েছেন। কবিতা-অনুবাদে লোয়েল স্পষ্টতই এজরা পাউণ্ডের অনুগামী। কবিতা অনুবাদের আদর্শ ও পদ্ধতি-সম্পর্কিত ধারণায় একালে বিপ্লব এনেছেন পাউণ্ড। 'যে অতীত বর্তমান হতে পারে না তাকে মনে করে লাভ নেই'—কিয়ের্‌কেগার্ডের এই নির্দেশকে তিনি যেন চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন তাঁর অনুবাদচর্চায়। অনুবাদ্য কবিতাগুলি থেকে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা ছেঁকে তুলতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর অনুবাদে পুরোনো কবিরা বর্তমানেরই অংশ হয়ে গেছেন; আধুনিক কবিতার লয়, স্বরভঙ্গিমা ও বাক্‌পদ্ধতিগত ঝোঁকের মধ্য দিয়ে তিনি মূল কবিকর্মগুলিকে পুনরুপায়িত করতে চেয়েছেন। লোয়েল ছাড়া কবিতা-অনুবাদের ক্ষেত্রে এজরা পাউণ্ডের উল্লেখযোগ্য অনুগামীদের মধ্যে আরও রয়েছেন, মারিয়ান মুর, ক্রিস্টোফার লোগ্‌ প্রভৃতি। লা ফঁতেনের 'ফেব্‌লস্'-এর ইংরেজী অনুবাদিকা মারিয়ান মুর স্পষ্ট ভাষাতেই ঘোষণা করেছেন, যে এজরা পাউণ্ডের অনুবাদচর্চা তাঁর পক্ষে এক ঢালক নীতি হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রাচীন রীতির অনুবাদকদের মধ্যে আত্ম-অপনীতির প্রবণতা কমবেশি লক্ষণীয়, যেমন আধুনিক রীতির অনুবাদকদের অভিমুখিতা অল্পবিস্তর আত্ম-

অভিব্যক্তির দিকে। প্রাচীনদের কাব্যজগৎ ও আধুনিকদের কাব্যজগতের বিভেদ নির্দেশ করতে গিয়ে শিলার যে দুটি অভিধা ব্যবহার করেছিলেন, তাকেই গ্রহণ ক'রে রেনাতো পোগিওলি প্রাচীন রীতির অনুবাদকদের 'নাঈভ' ও আধুনিক রীতির অনুবাদকদের 'সেন্টিমেন্টাল' ব'লে অভিহিত করেছেন।[৩৩] অধিকতর ঐতিহ্যানুসারী সংস্কৃতির মধ্যে যে সব অনুবাদকরা লালিত হয়েছিলেন, এবং যাঁরা দিব্য উদ্‌ভাসন ও প্রাচীন প্রজ্ঞার পবিত্র গ্রন্থগুলিকে স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর জীবন্ত মুখের ভাষায় রূপায়িত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের অনুবাদ-প্রয়াস অবশ্যই অনুবাদের পুরোনো পদ্ধতির সূচক। আধুনিক অনুবাদক সমস্ত আধুনিক শিল্পীর মতোই অতীব আত্মমুখী; আত্ম-প্রকাশের দিকে খুব স্পষ্ট প্রবণতা তাঁর, যদিচ সে আত্ম-প্রকাশ তাঁর আত্ম-স্বরূপের হুবহু অভিব্যক্তি না হতে পারে। মূল কবির মতোই, একালের দৃষ্টিতে, কবিতা-অনুবাদক একজন নার্শিসাস[৩৪] যিনি তাঁর নিজের তুল্যতা অনুধাবন করেন শিল্পের জলাশয়ে। এজরা পাউণ্ডের কবিতার পর্যালোচনাসূত্রে[৩৫] টি. এস. এলিঅট মন্তব্য করেছিলেন যে, পাউণ্ডের 'দি সিফেয়ারার' 'ক্যাথে'-র মতো 'ভালো অনুবাদ নিছক অনুবাদ নয়, কারণ অনুবাদক নিজের মধ্য দিয়ে মূলকে উপস্থিত করছেন এবং মূলের মধ্য দিয়ে নিজেকে সন্ধান করেছেন।' আর, এক সাক্ষাৎকারে[৩৬] সাক্ষাৎকারী ফ্রেডেরিক সেইডেলের জিজ্ঞাসার জবাবে লোয়েল যদিচ জানিয়েছিলেন: 'রিল্‌কে এবং র‍্যাঁবোর যে কবিতাগুলি আমি অনুবাদ করেছি তাদের সঙ্গে কিছুটা নৈকট্য আমি অনুভব করেছিলাম, অথচ তাঁরা যে সব জিনিস করেছিলেন তা আমি করতে পারতাম না। আমার অনুবাদগুলি একই সঙ্গে আমার নিজস্ব প্রবণতার ক্রমানুস্মৃতি এবং নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা।'—তবু তাঁর অনুবাদচর্চায় জোরটা যে পড়েছে তাঁর আত্মস্বরূপের উন্মোচনের ওপর, এ সত্য ঢাকা পড়ার নয়। তাঁর অনুবাদ-কবিতার সংকলন 'ইমিটেশন্‌স্'-এর পূর্বোদ্ধৃত মুখবন্ধে তাই তিনি ঐ সংকলন সম্পর্কে লিখেছেন: "এই বইটি অংশতঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও এর উৎসগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রথমে একটি পরম্পরা হিসেবে পঠনীয়; অনেক ব্যক্তিত্ব, বৈপরীত্য এবং পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে একটিই স্বর প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে।"—এ স্বর তো স্পষ্টতঃই অনুবাদকের কবি-ব্যক্তিত্বেরই স্বর।

কবিতা-অনুবাদের পাউণ্ড-অবলম্বিত আদর্শ ও পদ্ধতি নিয়েও তুমুল বিতর্কের শেষ নেই! রিচমণ্ড লাটিমোর সুষ্ঠশীল কবিতা-অনুবাদ অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ ভার্স ট্রান্সলেশন এবং পুরোনো ভিত্তির ওপর নতুন রূপায়ণ অর্থাৎ দি নিউ ভার্সান অন্

এ্যান ওল্ড বেস্—এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের ওপর জোর দিয়েছেন।[৩৭] দ্বিতীয় প্রকার রূপায়ণের দৃষ্টান্ত তিনি খুঁজে পেয়েছেন পাউণ্ডের 'উইমেন অফ্ ট্রাসিস'-এ (যদিচ আরও সরলভাবে তাঁর আগেকার কিছু অনুবাদকর্মেও এই একই দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়)। তিনি মনে করেন না, যে 'উইমেন অফ্ ট্রাসিস' প্রকৃতই একটি অনুবাদ। কবিতা-অনুবাদ তাঁর মতে—লেখক+অনুবাদক। 'উইমেন অফ্ ট্রাসিস'—O+পাউণ্ড। এতে সফোক্লিসের কিছুই পাওয়া যায় না। আবার এই 'উইমেন অফ্ ট্রাসিস'-কেই একটি দীর্ঘ আলোচনায় ক্রিয়েটিভ ট্রানস্লেশন বা সৃষ্টশীল অনুবাদের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদন করেছেন এইচ. এ. ম্যাসন।[৩৮] তাঁর মতে ক্রিয়েটিভ ট্রানস্লেশন বিরল, এবং তা দুটি কারণে: কেবলমাত্র একজন মহৎ কবির ক্ষেত্রেই প্রত্যাশা করা যায় যে তিনি অনুবাদকালে মহৎ কবিতা রচনা করবেন এবং একটি যুগের প্রকৃত প্রয়োজন আবিষ্কার-ক্ষম ব্যক্তিই অনুবাদের দ্বারা ঐ প্রয়োজন পূরণের একটি সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন।

অনুবাদকের কিছু কিছু স্বাধীনতা গ্রহণে রবার্ট গ্রেভ্সের আপত্তি নেই। তাঁর মতে: অনুবাদক মূলের ছোটোখাটো ভুল শুধ্‌রে দিতে পারেন; মূলের উল্লেখগুলি বিশদ করারও ক্ষমতা আছে তাঁর; এমন কি একঘেয়েমি দেখা দেবার সম্ভাবনা বুঝলে তিনি মূলের কিছু সংক্ষেপও করে নিতে পারেন; শুধু তিনি মূলের ওপর নতুন ভাবধারা আরোপ করতে পারবেন না। গ্রেভ্স নিজে হোমারের ইলিয়াড অনুবাদ করতে গিয়ে দুটি-একটি হোমার-পরবর্তী প্রক্ষেপ বাদ দিয়েছেন এবং সহজবোধ্য কতকগুলি বিভাগে জাহাজের তালিকাটি পুনর্বিন্যাস করেছেন। তাঁর ধারণা ইলিয়াডের অনুবাদ যত বিশ্বস্ত হবে ততই তা মূলের প্রতি কম সুবিচার করবে। অধ্যাপক লাটিমোরের অনুবাদ তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি। তবে অধ্যাপক লাটিমোর তো অন্ততঃ পণ্ডিত; তার চেয়ে অনেক খারাপ জিনিস অনুবাদের নামে বেরিয়ে আসে সাহিত্যিক এ্যামেচারদের হাত দিয়ে। এমন একজন সাহিত্যিক অ্যামেচার হচ্ছেন এজরা পাউণ্ড। তাঁর প্রপার্টিয়ুস-অনুবাদ সম্পর্কে এমন বিধ্বংসী মন্তব্য করেন গ্রেভ্স[৩৯]: "মিঃ পাউণ্ডের অনুবাদ নির্ভর করে আছে লাতিনের প্রায় নিখুঁত অজ্ঞতা ও নিকটতম ইংরেজী প্রতিশব্দ থেকে প্রপার্টিয়ুসের রচনার অর্থ অনুমান করে নেওয়ার ওপর।" একটি চিঠিতে[৪০] এজরা পাউণ্ড নিজে জানিয়েছেন যে প্রপার্টিয়ুসের রচনার আক্ষরিক অনুবাদ দূরে থাক, অনুবাদেরই কখনও কোনও প্রশ্ন ছিল না। তাঁর কাজ ছিল একটি মৃত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা, একটি জীবন্ত মূর্তিকে উপস্থিত

করা। আর একটি চিঠিতেও[৪১] তিনি সরাসরি জানিয়েছেন: না তিনি প্রপার্টিয়ুসের রচনার অনুবাদ করেন নি।

জন হ্যাণ্ডার পাউণ্ডের 'দি সিফেয়ারার'-কে 'লিটারারি মিস্ট্রান্সলেশন'-এর দৃষ্টান্ত এবং কতকগুলি 'ফর্চ্যুনেট হাউলার'-এর ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠা বলে মনে করলেও তার একাধিক সদর্থক দিক এবং কবিতা-অনুবাদ সম্পর্কিত অধিকাংশ আধুনিক মতবাদের ওপর তার পর্যাপ্ত প্রভাব লক্ষ্য করতে ভোলেন নি।[৪২] আবার জর্জ স্টেইনার মনে করেন, যে[৪৩] পাউণ্ডের প্রকৃত অনুবাদগুলি 'তেমনি নিশ্চিতভাবে বিংশ শতাব্দীতে কবিতা-অনুবাদের সংজ্ঞার্থ ও আদর্শকে পাল্টে দিয়েছে যেমন পাউণ্ডের কবিতা নবীকৃত বা বিপর্যস্ত করছে আধুনিক ইংরেজী ও মার্কিন কাব্যতত্ত্বকে।...'দি রিভার মার্চেণ্ট'স ওয়াইফ' (১৯১৫)-এর পর অনুবাদের শিল্প তার আধুনিক পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল।...তিনি (পাউণ্ড) বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন অনুবাদের প্রকাশরীতিতে, অনুবাদ কি, এবং তার সঙ্গে মূলের কি সম্বন্ধ—সে-সম্পর্কিত ধারণায়।...রুপদী কবিতার সমকালীন অনুবাদক এবং এমন কি পাঠকও পাউণ্ডের পর আসেন যেমন কিউবিজ্‌মের পর আসেন আধুনিক চিত্রকর।'

জন সাইমন 'অ্যাবিউজ্ অফ্ প্রিভিলেজ: লোয়েল অ্যাজ্ ট্র্যান্সলেটর' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে[৪৪] লোয়েলের 'ইমিটেশন্স্' থেকে রিল্‌কে, র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, মন্‌তালে প্রভৃতি কবির কবিতা-অনুবাদের নিদর্শন উদ্ধার ক'রে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে লোয়েল মূল কবিতাগুলির তাৎপর্য ও শব্দশরীরকে যথেচ্ছ ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত ক'রে অনুবাদকের অধিকারের চরম অপব্যবহার করেছেন। সাইমন ওখানে লিখেছেন: "লোয়েলের 'ইমিটেশন্স্'-এর জনক যে পাউণ্ড এবং বিশেষভাবে প্রপার্টিয়ুস-অনুবাদের পাউণ্ড তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু যদিও আমি পাউণ্ডের প্রপার্টিয়ুসের বিশেষ গুণমুগ্ধ নই,...তা ব'লে প্রপার্টিয়ুসের পাউণ্ড সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রপার্টিয়ুস পাউণ্ডের যে কবিত্বশক্তিকে প্রকটিত করেছে, তার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকতে পারি না। কিন্তু এরকমটি যে হয়েছে তার প্রকৃত কারণ পাউণ্ড তার মূলকে অত্যন্ত মহিমান্বিতভাবে উপেক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং তিনি নিজে খুবই বড়ো কবি আর তাই সেক্সটাস্ প্রপার্টিয়ুসের পক্ষে যা ক্ষতি তাই হয়ে উঠেছে এজরা পাউণ্ড ও ইংরেজী মুক্ত ছন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। লোয়েল কিন্তু তাঁর অনুবাদে মূল রচনাগুলির নিয়ন্ত্রণ থেকে তেমন মুক্ত নন, তাঁর মুক্তছন্দেরও নেই পাউণ্ডের মুক্তছন্দের মতো শক্তি ও বৈচিত্র্য।"

জন সাইমন পাউণ্ডের কবিত্বশক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হলেও তাঁর কবিতা-অনুবাদের আদর্শ ও পদ্ধতিকে নিশ্চয়ই অনুমোদন করেন না। তিনি শুধু বলতে চান যে পাউণ্ডের অনুবাদ স্বতন্ত্র কবিতা হিসেবে অন্ততঃ সমাদরযোগ্য, কিন্তু লোয়েলের অনুবাদ অনুবাদ হিসেবে যেমন বিকৃত, কবিতা হিসেবে তেমনই অতৃপ্তিকর। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুঅধীতী একালের একজন অগ্রণী বাঙালী কবি অমিয় চক্রবর্তী কিন্তু লোয়েলের এই অনুবাদ সম্পর্কেই প্রশংসায় অকুণ্ঠ : "রবার্ট লোয়েল আজকের মার্কিন কবিশ্রেষ্ঠ,… ।…চিরদিনের বোরিস পাস্টারনাক-এর কবিতা লোয়েলের তর্জমায় এই প্রথম মৌলিক দীপ্তি পেয়েছে ; বলা যায় এই অনুবাদে (যাকে লোয়েল বিনীতভাবে বলেছেন 'অনুকরণ') রাশিয়ার কবি অন্যদেশে যথার্থ অবতীর্ণ হলেন। রিল্কে এবং ফরাসী সিম্বলিস্ট ইমেজিস্ট কবিদের লেখাও লোয়েলের ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে চেনা যায়।"[৪৫] 'মৌলিক দীপ্তি' ও 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কথাদুটি আমাদের বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেয়, যে কবিতা-অনুবাদের আদর্শ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুবাদকের উদ্‌ভাবনের স্বাধীনতা ও অনুবাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যের প্রতি প্রধান মনোযোগ দানকে অমিয় চক্রবর্তী বিশেষভাবে অনুমোদন করেন বলেই লোয়েলের কবিতা-অনুবাদ তাঁর এতখানি মুগ্ধতা কেড়েছে।

অনুবাদের সততা ও স্বাধীনতা, মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা ও স্বতন্ত্র কাব্য-সার্থকতা, আত্মতা, ও নৈরাত্মতা—এই দুই বিপ্রতীপ প্রবণতাকে তাঁর অনুবাদ-প্রয়াসে যথাসম্ভব মেলাতে চেষ্টা করবেন কবিতা-অনুবাদক, সাধারণভাবে পাঠকমনে এমনতরো প্রত্যাশা জেগে ওঠাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ তিনি চাইবেন : প্রথমতঃ অনুবাদক মূল কবিতার প্রসঙ্গের বা ভাব ও ভাবনার এবং প্রতীক, প্রতিমা, ছন্দ, মিল, ধ্বনিস্পন্দন, স্তবকবিন্যাস, অর্থাৎ সমগ্র প্রকরণের বা রূপশিল্পের, মূল কবিতার মধ্যে আধারিত কবির দেশ-কালের বিশেষ আবহের, সর্বোপরি কবির বিশিষ্ট মেজাজ ও কবিতার অনন্য আস্বাদের যতখানি সম্ভব আভাস তাঁর অনুবাদে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয়তঃ অনুবাদক একই সঙ্গে বিশেষ সজাগ থাকবেন, যে ভাষায় তিনি অনুবাদ করছেন, সেই ভাষার নিজস্ব স্বভাবধর্ম, বাগ্‌ধারা যেন বিপর্যস্ত না হয়, সেই ভাষার একটি মৌলিক কবিতার মতোই তা যেন সজীব, আস্বাদ্য স্বতঃস্ফূর্ত, স্বচ্ছন্দ-পাঠ্য হয়ে ওঠে, স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যে, শিল্পসার্থকতায় হয় গরীয়ান্। কবিতা-অনুবাদে অনুবাদ-প্রয়াসের ক্লিষ্টতা, আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতার চিহ্ন যেন একটুও না থাকে, তার ওপর অনেকেই খুব জোর দিয়েছেন। একিলিস ফ্যাং একটি প্রবন্ধে[৪৬] তাই—'আমার কাছে

একটি অনুবাদের প্রথম প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয় যে তা একটি অনুবাদের মতো শোনাবে না।'—লা ফঁতেনের 'ফেব্‌লস্'-এর ক্ষমতাসম্পন্না অনুবাদিকা মারিয়ান মুর-কর্তৃক ১৯৫০-এ উচ্চারিত এই উক্তিকে অনুবাদের শিল্প সম্পর্কে শেষ কথা ব'লে গ্রহণ করেছেন।

কবিতার অনুবাদে বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়, যখন অনুবাদক মূল ভাষা থেকে সরাসরি অনুবাদ না ক'রে প্রধানতঃ অন্য একটি ভাষায় অনুবাদের মধ্যস্থতাতেই তার সম্মুখীন হন। বাংলায় ফরাসী, জর্মান, ইতালীয়, হিস্পানী, রুশ প্রভৃতি ভাষার কবিতা-অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজী অনুবাদকে মুখ্যতঃ অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিছক একটি অনুবাদের অনুবাদ করলে ব্যর্থতা প্রায় অবশ্যম্ভাবী। মূল ও অনুবাদে অনেকটা ব্যবধান তখন এমনিতেই রচিত হয়ে থাকে। তদুপরি ইংরেজী অনুবাদটিতে মূলের বহুল-বিকৃত উপস্থাপন থাকলে, অকারণ, অযৌক্তিক, হানিকর স্বাধীনতা নেওয়া হলে, বাংলা অনুবাদটি ইংরেজী অনুবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতী না হয়েও মূলের প্রসঙ্গ, প্রকরণ, আবহ ও মেজাজের উপযোগী আভাসকে ধ'রে দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে যদি অনুবাদক অনুবাদ-কর্মে মূল লেখন, মূল ভাষার অভিধান—যাতে মূল ভাষার শব্দের অন্ততঃ ইংরেজী অর্থ দেওয়া আছে—মূল রচনার একাধিক ইংরেজী আক্ষরিক গদ্য-রূপান্তর, একাধিক ইংরেজী কবিতা-অনুবাদ অবলম্বন করেন ; মূল কবিতার অভিপ্রায়, শব্দ ও চিত্রকল্পের প্রয়োগ তিনি বুঝে নিতে চেষ্টা করেন একই কবিতার ভিন্ন-ভিন্ন ইংরেজী অনুবাদ তুলনা ক'রে, অভিধান, মূল ভাষাবিদ্ এক বা একাধিক ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে, সমালোচকদের ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের দ্বারস্থ হয়ে ; তাহলে মূল রচনার সঙ্গে পরোক্ষ পরিচয়ের অসুবিধা তিনি বোধহয় বেশ কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এই ধরনের অনুবাদ-প্রক্রিয়াই তো বুদ্ধদেব বসু তাঁর নিজের বিবৃতি-অনুযায়ী, বোদলেয়ার, রিল্‌কে ও হোল্ডালিনের কবিতা-অনুবাদে আশ্রয় করেছিলেন।

কবিতা-অনুবাদে উপযুক্ত ভাষারীতির প্রয়োগে অনুবাদককে একটা বড়ো সমস্যার জট ছাড়াতে হয়। প্রাচীন, অর্ধ-প্রাচীন, নিকট-অতীত, সমকালীন—সমস্ত রকমের কবিতা-অনুবাদে নিশ্চয়ই তিনি সমকালীন ভাষারীতিকেই ভিত্তি-স্বরূপ গ্রহণ করবেন, যেহেতু তাৎপর্যপূর্ণ অনুবাদমাত্রেই রঞ্জিত হয়ে ওঠে নিঃসংশয় সমকালীনতায়, কিন্তু তা ব'লে সকল কবি ও কবিতার রূপান্তর প্রয়াসেই তো আর তিনি একেবারে একই ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না! সেক্ষেত্রে তাঁর

প্রচেষ্টা পর্যবসিত হবে মূল কবি ও কবিতার বৈশিষ্ট্যের আভাস-বিরহিত চরিত্রহীন নির্জীব এক ভাষান্তরে। সমস্যাটি এই ধরনের একটি প্রশ্নাকারে যদি সাজিয়ে নিই : ১৯৮০-তে কোনও তরুণ বাঙালী কবি স্থির করলেন যে তিনি শেক্‌স্‌পীয়র, কীট্‌স, হপকিন্‌স, এলিঅট, ডিলান টমাস ও সিলভিয়া প্লাথের কবিতা সমকালীন বাংলা কবিতার ভাষারীতিকে ভিত্তি ক'রেই অনুবাদ করবেন। তাঁর সমস্ত অনুবাদেরই ভাষা কি হুবহু একই ধরনের বাংলা হবে? এর উত্তর স্বভাবতই হবে, একটি সজোর 'না'। মূল কবির ও তাঁর কবিতার উপস্থাপন-রীতির বৈশিষ্ট্য, যাঁর পেছনে রয়েছে ঐ কবির বিশেষ দেশকাল ও ব্যক্তিত্বের প্রবর্তনা, তার আভাস অনুবাদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, ঐ কবির কাব্যসৃষ্টির বিশেষ আবহ ও মেজাজ, তার অনন্য আস্বাদ অনুবাদে যথাসম্ভব সঞ্চারিত করতে হলে, অনুবাদককে সমকালীন ভাষারীতির মূল বুনটের ওপর বিশেষ বিশেষ শব্দ বা শব্দবন্ধের প্রয়োগে, শব্দের বিশেষ বিন্যাসকৌশলে, বৈচিত্র্য আনতে হবে। উপযোগী ভাষাপ্রয়োগের এই সমস্যা বিশেষ ও তীব্র জটিল হয়ে ওঠে যখন অনুবাদক প্রাচীন কবিদের কবিতা অনুবাদ করতে অগ্রসর হন। কারণ তখন তাঁকে সর্বাগ্রে এড়িয়ে চলতে হয়, প্রত্নরীতির নিষ্প্রাণ আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা এবং আধুনিক রীতির লঘু প্রগল্‌ভতা—এই দুই ফাঁদ। ডব্লু. এইচ. ডি. রাউজকে লেখা একটি চিঠিতে[৪৭] এজরা পাউণ্ড পত্র-প্রাপকের হোমারের অডিসির ইংরেজী অনুবাদ-প্রয়াস সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে অনুবাদের লক্ষ্য এইভাবে উপস্থিত করেছিলেন : '(১) ইংরেজী রূপান্তরে স্বাভাবিক বুলি (২) মূলের প্রতি বিশ্বস্ততা (ক) অর্থের দিক দিয়ে (খ) আবহের দিক দিয়ে।' কিন্তু এই স্বাভাবিক ইংরেজী বুলির মধ্য দিয়ে কিভাবে ধরতে পারা যাবে হোমারের রচনার বিশিষ্ট মেজাজ, তাঁর বর্ণনৈপুণ্যের অসামান্য আস্বাদ? ঐ একই ব্যক্তিকে লেখা আর একটি চিঠিতে[৪৮] এজরা পাউণ্ড জানিয়েছেন যে, 'হোমারের রচনা পাঠের মুখ্য অনুভূতি, সদ্যোজাত সতেজতা।...যে অনুবাদ তাকে ধরতে পারে না তা খারাপ। তাকে ধরতে হলে অবশ্যই নতুন শব্দসমবায় তৈরি করতে হবে।' অর্থাৎ হোমারের কাব্যানুবাদক হোমারের রচনার বিশেষ মেজাজ, অনন্য আস্বাদকে আধারিত করতে, সেই পুরোনো সময়ের, পুরোনো পৃথিবীর নিজস্ব আমেজকে ধরতে, সমকালীন জীবন্ত ইংরেজী বুলির ভিত্তিতেই নতুন শব্দসমবায় সন্ধান করবেন। টি. এস. এলিঅট, তাঁর সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় 'হেলেনিষ্ট' অধ্যাপক মারের য়ুরিপিডিস-অনুবাদের ব্যর্থতা অনুধাবন করতে গিয়ে জানিয়েছেন : '...এটা ধারণার অতীত যে গ্রীক কবিতার ধ্বনি সম্পর্কে প্রকৃত অনুভূতিসম্পন্ন

কেউ যথাযথ সমতুল্য হিসেবে স্বেচ্ছায় বেছে নেবেন উইলিয়ম মরিসের দ্বিপদী, সুইনবার্নের গীতিকবিতা।...আমাদের সেই চোখ চাই, যা অতীতকে বর্তমান থেকে তার সুস্পষ্ট ভিন্নতাসহ নিজের জায়গায় যেমন দেখতে পাবে, তেমনি তাকে এমন সজীবও দেখবে যাতে তা আমাদের কাছে বর্তমানের মতোই বর্তমান থাকে। এই চোখ হল সৃষ্টিশীল চোখ; এবং যেহেতু অধ্যাপক মারের কোনও সহজাত সৃষ্টি-প্রবৃত্তি নেই তাই তিনি য়ুরিপিডিসকে একেবারে মৃত ক'রে ছাড়েন।'[৪৯] বাস্তবিক এই সৃষ্টিমানসতায় ও সৃষ্টিশক্তিতে দীনতা থাকলে অনুবাদক সার্থক কবিতা-অনুবাদে প্রার্থিত সেই উপযোগী নতুন শব্দসমবায় কখনই খুঁজে পেতে পারেন না।

তত্ত্বের ক্ষেত্রে, মূল কবিতার প্রতি অনুবাদকের বিশ্বস্ততা ও অনুবাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্য ও আস্বাদ্যতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা, তাঁর সততা ও স্বাধীনতাস্পৃহা, এই দ্বিমুখী প্রবণতার সমপ্রাধান্যকে অনুবাদকের অন্বিষ্ট হিসেবে হয়তো মেনে নেওয়া যায়, এমন কি একথাও কবুল করা যায় যে জ্ঞানত অনুবাদের মূলানুগত্য এবং কবিতা হিসেবে তার শ্রুতিসুভগতা তথা শিল্পসাফল্য, এ দুয়ের কোনোটিকেই ছাড়তে চাইবেন না অনুবাদক, যেহেতু এ দুদিককে মেলানোর অসাধ্যসাধনের রোমাঞ্চই তাঁকে অনুবাদের কাজে প্রবলভাবে টানে, তবু কার্যক্ষেত্রে এ দু দিক বাঁচিয়ে, আত্মনুপ্তিতা ও আত্মলোপের দ্বান্দ্বিকতাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সত্যিই কি চলতে পারা তাঁর পক্ষে সম্ভব? অনুবাদটি পড়তে গিয়ে সজাগ পাঠকের অনিবার্যভাবে কি মনে হবে না যে অনুবাদকের অভিনিবেশ বা দক্ষতার পাল্লা একদিকে অন্ততঃ একটুও ঝুঁকে পড়েছে? একথাও কি বলা যায় না যে অনুবাদক নিজে কবি হ'লে অনুবাদে তাঁর স্বতন্ত্র কবিব্যক্তিত্ব কমবেশি প্রকটভাবে প্রকাশ পাবেই এবং সেই সূত্রেই দেখা দেবে তাঁর অনুবাদটিকে স্বতন্ত্র কবিতারূপে সজীব ও চরিতার্থ করে তোলার দিকে অধিক নিবিষ্টতা? মোহিতলাল মজুমদার তাঁর চতুর্থ কবিতা-সংগ্রহ 'হেমন্ত-গোধূলি'-র প্রারম্ভিক নিবেদনে বইটিতে সন্নিবেশিত বিদেশী কবিতার অনুবাদগুলি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন : "আমার অনুবাদ যেমন মূলের ঘনিষ্ঠ অনুবাদ নয়, তেমনই ভাষায় ও ভাবে তাহা একেবারে ভিন্ন পদার্থও নয়। অর্থ অপেক্ষা ভাবকে প্রাধান্য দিলেও, আমি মূলের বাণীছন্দকে যতদূর সম্ভব বাংলায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাষা আমারই, এবং তাহা বাংলা বলিয়া যেটুকু রূপান্তর হইতে বাধ্য, তাহার জন্য এগুলির উৎকর্ষ অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক রচনাহিসাবেই অধিক—এরূপ দাবী আমি করিব না; পাঠকগণকে কেবল ইহাই লক্ষ্য করিতে বলি—এগুলি বাংলা এবং কবিতা হইয়াছে কিনা;

তাহা যদি না হইয়া থাকে, তবে ইহাদের কোন মূল্য নাই।" কবিতা-অনুবাদকের দুই বিপরীত দায় যা কবিতা-অনুবাদের দুই বিপরীত আদর্শের মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে চলার মনোভাব প্রথমে প্রকাশ করেও শেষে মোহিতলাল অনুবাদের ভাষায় আস্বাদ্যতা ও স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যের দিকে স্পষ্টতই পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন। 'হেল্ডার্লিন-এর কবিতা'-র প্রারম্ভে 'অনুবাদকের বক্তব্য'-এ বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: 'অন্য একটি বিষয়েও আমি নিরন্তর মনোযোগী ছিলাম—যাতে বাংলা ভাষার কবিতা হিশেবে অনুবাদগুলি পাঠযোগ্য হয়, কেননা আমার বিশ্বাস যে কবিতার অনুবাদের পক্ষে কবিতা হ'য়ে ওঠাই সবচেয়ে জরুরি দরকার।[৫০] এখানেও দেখি এক কবি-অনুবাদকের অনুবাদের স্বতন্ত্র কাব্যমূল্যকে সুস্পষ্ট প্রাধান্য দান। আবার পুদ্দর দাশগুপ্তের সঙ্গে এক 'কবিতা বিষয়ক আলোচনা'সূত্রে[৫১] একালের আর একজন অগ্রণী কবি-অনুবাদক অরুণ মিত্র এমন উসকে দেওয়া মন্তব্য করেন: "অনুবাদ প্রভাবিত করে, না প্রভাবিত হয় সেটাই এক প্রশ্ন। অনুবাদের কাজে নিজের ব্যক্তিত্বকে ঠেকিয়ে রাখা খুব কঠিন।' অবশ্যই কবিতার অনুবাদে একজন যথার্থ সৃষ্টশীল কবির ব্যক্তিত্বই এইভাবে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

কবিতার অনুবাদে সার্থকভাবে ব্রতী সাধারণত একজন কবিই হতে পারেন। অনুবাদ্য কবিতার কবির সঙ্গে অনুবাদক হিসেবে একজন কবিই সবচেয়ে গভীরভাবে আত্মীয়তা পাতাতে পারেন। তাঁরই হৃদয়ে সবচেয়ে অমোঘ হতে পারে ঐ কবির কবিতার সংক্রাম। ঐ কবিতার অভিঘাতে সবচেয়ে আন্তরিকভাবে সাড়া দিতে পারেন তিনিই। একটি কবিতার অনন্য আস্বাদ ও আবেদনের মূলে যে অতল রহস্যময় দ্যোতনা তাকে অনুবাদে যতখানি সম্ভব ধরতে পারা একজন কবির পক্ষেই তো স্বাভাবিক। আর কবিতার প্রকাশরীতি তাঁর নিরন্তর অনুশীলনের বিষয় ব'লে, অনুবাদকে স্বতন্ত্র কাব্যগুণে ঋদ্ধ বা স্বকীয় শিল্পসামর্থ্যে পরাক্রান্ত ক'রে তোলাও তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে। 'এন্‌কাউন্টার' পত্রে তিনজন সাহিত্যসন্ধিৎসুর র‍্যাঁবোর কাব্যানুবাদ-সম্বন্ধীয় চিঠির উত্তর দিতে গিয়ে তাই তো লোয়েল অত জোরের সঙ্গে জানাতে পেরেছিলেন: 'কেউ নিজে কবি না হলে তাঁর পক্ষে অপর ভাষার কবিতাকে নিজের ভাষায় কবিতা ক'রে তোলা সম্ভব নয়।'

সাধারণভাবে এটুকু অবশ্য বলা যেতে পারে যে কবিতার অনুবাদক আক্ষরিক অনুবাদের বিভ্রান্তিকর মোহে পথ হারিয়ে ফেলে মূল কবির শব্দদাসে যেমন

পরিণত হবেন না, তেমনি স্বাধীনতার যথেচ্ছ অপব্যবহারে মূলকে তিনি একেবারে বিকৃত ও বিনষ্ট করে ফেলবেন না, ভাবগত যাথার্থ্য ও রূপগত আভাসের একটা ন্যূনতম শর্ত তাঁকে পালন করতে হবে। বস্তুতঃ আক্ষরিক অনুবাদ মূল কবিতার সামগ্রিক তাৎপর্য, সজীব অভিঘাত, বিশিষ্ট রসাবেদনকে ছুঁতে পারে না। ডাড্‌লে ফিট্‌স ও মারিয়ান মূরের কবিতা-অনুবাদ পর্যালোচন করতে গিয়ে John Ciardi মূলের আক্ষরিক আনুগত্যের ফলে উদ্ভূত "translatorese" নামক এক অদ্ভুত ভাষার কথা বলেছেন যা মূলের শব্দই শুধু গুণে চলে কিন্তু তার প্রাণশক্তির কোনও হদিস পায় না।[৫২] নির্বিচার আক্ষরিক অনুবাদে, মূলের প্রতি উপলব্ধি-হীন যান্ত্রিক আনুগত্যে, মূল কবিতাটির প্রসঙ্গ ও প্রকরণের নিজস্ব ঐশ্বর্য, বিশেষ আবেদন, অমোঘ অভিঘাত লোপ পায়; একটি সজীব, সৃষ্টগুণসম্পন্ন কবিতার বিনিময়ে সেখানে হাতে আসে বর্ণহীন, নিষ্প্রাণ, স্বাতন্ত্র্যরিক্ত এক লিখন; শুধুই সারিবদ্ধ মৃত শব্দাবলী। এই সূত্রে এডওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ডের দুটি প্রবাদপ্রতিম উক্তি অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে: 'খড়-ঠাসা ঈগলের চেয়ে জ্যান্ত চড়ুই ভালো'; আর 'মৃত সিংহের চেয়ে জীবন্ত কুকুর ভালো'। অবশ্যই ফিট্‌জেরাল্ড বলতে চান: মহৎ কবিতার অনুবাদে মূলের প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত হতে গিয়ে অনুবাদক যদি একটি কৃত্রিম, আড়ষ্ট, নির্জীব রচনা উপস্থিত করেন, তাহলে তার চেয়ে অনেক কাঙ্ক্ষিত বলে মানতে হবে, মূল কবিতার স্বাধীন পুনর্বিন্যাসে গড়ে তোলা, অপেক্ষাকৃত কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সপ্রাণ, স্বাদু একটি কবিতা। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব বিন্যাস আছে, অপর ভাষায় সেই বিন্যাস হুবহু ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা পরিণামে ব্যর্থতাকেই ডেকে আনে। মূল কবিতার ভাষা ও অনুবাদের ভাষার প্রকৃতিগত বৈষম্যের জন্যই অনুবাদকের স্বাধীনতাগ্রহণ অনেকসময়ে অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ কবিতা-অনুবাদে প্রাতিস্বিক উপলব্ধি ও বিচারবোধের ভূমিকা কিছুটা থেকেই যায়। এই দিক দিয়েই কবিতার অনুবাদকে বলা যেতে পারে কবিতার একপ্রকার ব্যাখ্যান বা ভাষ্য। ডাড্‌লে ফিট্‌সের কথায়: অনুবাদক অবশ্যই হবেন একজন কবি ও ব্যাখ্যাতা। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে তাঁর ব্যাখ্যান অবশ্যই হবে একটি কাব্যকর্ম।[৫৩] অনুবাদককে প্রায়শই স্বকীয় বোধ ও অনুভূতি আশ্রয় ক'রে অনুবাদ্য কবিতার সমগ্র বা অংশের তাৎপর্য-দ্যোতনা নিরূপণ করতে হয়। অভিধান অনেক সময়েই একটি শব্দের তুল্য অর্থবাচক অনেকগুলি শব্দ অনুবাদকের সামনে হাজির করে; অনুবাদক শব্দটির বিন্যাসগত প্রসঙ্গসূত্র, অভিপ্রায়, অনুষঙ্গ, এমন কি কবিতাটি সামগ্রিক ভাব-

পরিমণ্ডল, কবির স্বরভঙ্গী বিচার ক'রে তার মধ্যে একটি শব্দ বেছে নেন। এই উপায়েই নিষ্পাদিত হয়ে ওঠে একটি শব্দবন্ধ বা বাক্য বা পঙ্‌ক্তির রূপান্তর। আবার মূল কবিতার সমগ্র বা অংশের ধ্বনি-অভিঘাত, ভাব-ব্যঞ্জনা ও উপস্থাপন-রীতির সঠিক আভাস অনুবাদে ফুটিয়ে তুলতে হলে, কবিতার অনুবাদককে প্রায়শই মূল কবিতার শব্দবিন্যাসের কিছু বদল ঘটাতে হয়, প্রয়োজন বোধ করতে হয় কমবেশি বর্জন ও সংযোজনের। কখনও কখনও অনুবাদের শিল্পোৎকর্ষের তাগিদেই বিশদীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, আর এখন শব্দ-সংযোজন হয়ে পড়ে একান্তই অপরিহার্য। ইংরেজী ভাষায় অনেক সময় খুব সাদাসিধে সহজ উচ্চারণও কবিতায় জাদুতে ভ'রে ওঠে, কিন্তু বাংলায় তার একান্ত অনুগত রূপান্তর কেমন নিষ্প্রাণ, রিক্ত, গদ্যময় বিবৃতিমাত্রে পর্যবসিত হয়ে যায়! সেখানে অনুবাদককে বাধ্য হয়েই তাই হয়তো একটু তির্যকতা আনতে হয়, দরকার বোধ করতে হয় অলংকার প্রয়োগের। টি. এস. এলিঅটের 'দি লাভ্ সং অফ্ জে. অ্যালফ্রেড প্রুফ্রক্'-এর বাংলা অনুবাদ 'জে অ্যালফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগান'-এ[৫৪] বিষ্ণু দে, মূলের—

When I am pinned and wriggling on the wall,
Then how should I begin

—এই দুটি পঙ্‌ক্তির যে রূপান্তর করেছেন :

যখন কাঁটায় বিঁধে দেয়ালে লট্‌কিয়ে করি ছটফট মুক্তির প্রত্যাশে
তখন কেমন ক'রে মুখ থেকে খুলে দিই খিল

—তাতে মূলের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অতি সহজ সাধারণ জিজ্ঞাসাটি যে অলংকৃত তির্যকতা পেয়েছে তা কি অনিবার্য ছিল না? 'Then how should I begin'-এর একেবারে বিশ্বস্ত অনুবাদ তো কখনই কবিতা হয়ে উঠতে পারত না।

কবিতা-অনুবাদের সার্থকতা বিচারে অনুবাদে মূল কবিতার তুল্য অভিঘাত সৃষ্টির কথা অনেকেই বলেছেন। অর্থাৎ মূল কবিতাটি মূল ভাষার পাঠকের মনে যেমন ক্রিয়া করত, অনুবাদটিও অনুবাদের ভাষায় পাঠকের মনে তেমন ক্রিয়া করে কিনা যাচিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু মূল ভাষার পাঠকমনে মূল কবিতার এই অভিঘাত জানবার কোনও সুনির্দিষ্ট উপায় আছে কি? বিশেষ করে প্রাচীন কবিতার অনুবাদে এই সমস্যা তো দুর্মোচ্য হয়ে দাঁড়ায়। কি করে জানা যাবে গ্রীক, রোমান্ ও সংস্কৃত কবিতা সমকালীন পাঠকমনে ঠিক কেমন অভিঘাতের সৃষ্টি করত? আর কবিতার আস্বাদনে ও বিচারে যুগভেদে কি পাঠকরুচি

পালটায় না? আর সূক্ষ্ম অনুধাবনে সমষ্টিগত ঐক্যকে কি ছাপিয়ে ওঠে না প্রাতিস্বিক অনুভবের ভিন্নতা? আবার ভাষায় ভাষায় বৈষম্য কি সমতুল্য অভিঘাত সৃষ্টির পথে একটা প্রতিবন্ধ তুলে দাঁড়ায় না? এই সমস্যা সমাধানের একটা উপায় ঠাওরেছিলেন ম্যাথ্যু আর্নল্ড। 'অন ট্রানস্লেটিং হোমার' নিবন্ধে তিনি হোমারের মহাকাব্যের যথাযথ অভিঘাত বিচারের ভার দিতে চেয়েছেন সেই সব পণ্ডিতদের ওপর যাঁরা একই সঙ্গে মূল গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও পর্যাপ্ত কাব্যিক রুচি-ও অনুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু কাব্য-বিচারে ঐ সব পণ্ডিতের সিদ্ধান্তই যে শেষ কথা তা কি করে মানবো? ম্যাথ্যু আর্নল্ড স্বয়ং হোমারের কাব্যের যে চারটি গুণ—দ্রুত গতিময়তা, অন্বয়ে ও শব্দসমূহে সরলতা ও প্রত্যক্ষতা, বিষয়ে ও ভাবে সহজতা, ভঙ্গীর মহত্ব—নির্দেশ করেছিলেন তার একটিও তো পুরোপুরি তর্কাতীত নয়।[৫৫] যেমন অনুবাদক কাউপার হোমারের কাব্যে খুঁজে পেয়েছিলেন দ্রুত গতিময়তার প্রায় বিপরীত। বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁর মনে পড়েছিল মিল্টনকে। আর হোমারের 'হিরোয়িক মিটার' সম্পর্কে অ্যারিস্টটল যে দুটি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তাঁর 'পোয়েটিক্স'-এ—সমস্ত ছন্দগুলির মধ্যে এই ছন্দই 'stateilest' ও 'weightiest' (মূল গ্রীক শব্দদুটির সম্ভাব্য নিকটতম দুটি ইংরেজী প্রতিশব্দ)—তা মিলটনের ছন্দ সম্পর্কেও প্রয়োজ্য হয়ে কাউপারের সিদ্ধান্তকেই স্পর্শ করে যায়। অতএব স্পষ্টতই ম্যাথ্যু আর্নল্ডের ধারণা অতি সরলীকরণের ভ্রান্তি-পীড়িত। তাই অনিবার্যভাবে আমাদের ফিরে আসতে হয় সেই কবি-অনুবাদকেরই কাছে। তাঁরই ব্যক্তিমানসতা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, কল্পনার মধ্য দিয়ে আমাদের মূল কবিতার সন্নিহিত হতে হয়; তাঁরই উপলব্ধি ও উপস্থাপনের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর ক'রে মূল কবিতার প্রসঙ্গ, প্রকরণ, আবহ ও অভিঘাতের বৈশিষ্ট্য চিনতে হয়।

ভালেরির কাছ থেকেই জ্যাক্‌সন্ ম্যাথ্যুজ 'অ্যাপ্রক্সিমেশন্ অফ্ ফর্ম' কথাটা ধার করে নিয়েছেন।[৫৬] অনুবাদককে মূল কবিতার রূপের সন্নিহিত হতে গেলে অনুকরণ নয়, উদ্‌ভাবনকেই আশ্রয় করতে হয়। অনুবাদক তাঁর ভাষায় এমন প্রকরণগত অভিঘাত উদ্‌ভাবন করবেন, যা মূল কবিতার প্রকরণগত অভিঘাতের আভাস দেবে। মূল কবিতার ছন্দ, মিল, ধ্বনি, অন্বয় প্রভৃতির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যকে অনুবাদে হুবহু রক্ষা করা অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে আপন উদ্‌ভাবন-সামর্থ্যের জোরে অনুবাদক মূলের ছন্দ, মিল, ধ্বনি, অন্বয় প্রভৃতির একটা আদল তাঁর অনুবাদে এনে দেবার চেষ্টা করতে পারেন। জ্যাক্‌সন্ ম্যাথ্যুজ মনে করেন যে

ফরাসী ছন্দ আলেক্‌সান্দ্রঁ্যা, যাতে রয়েছে বারোটি সিলেব্‌ল, তাকে চোখ বুজে একটি বারো সিলেব্‌ল বা ছয় বিটের ইংরেজী পঙ্‌ক্তিতে রূপায়িত করা চলে না। এই ভুলই করেছেন এড্‌না সেণ্ট ভিন্‌সেণ্ট মিলে ও জর্জ ডিলন তাঁদের বোদলেয়ার-অনুবাদে। ম্যাথ্যুজের ধারণা, সু-ব্যবস্থিত পেণ্টামিটারই একমাত্র ইংরেজী ছন্দ যার অভিঘাত আলেক্‌সান্দ্রঁ্যার অভিঘাতের সন্নিহিত হতে পারে। এই সূত্রে 'পরিচয়' পত্রে বুদ্ধদেব বসুর বোদলেয়ারের কবিতা-অনুবাদ আলোচনা করতে গিয়ে ফরাসী ভাষাজ্ঞানী কবি-অনুবাদক অরুণ মিত্রের অনুধাবন মনে পড়ে: সনাতন ফরাসী ছন্দ আলেক্‌সান্দ্রঁ্যাকে, যা মোট বারোটি স্বরধ্বনির এক একটি ছত্র—বাংলায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছত্রের অক্ষরবৃত্তে রূপান্তরিত করাই বাঞ্ছনীয়—হ্রস্ব ছত্রের মাত্রাবৃত্তে মূলের চলন মেলে না।

অলস ছাত্র-সহায়ক নিছক আক্ষরিক অর্থ-বোধক কবিতা-অনুবাদ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, মূলের অস্তিত্ব ছাড়া তা পঙ্গু, তাৎপর্যহীন। সার্থক কবিতা-অনুবাদ মূলের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি, উভয় পরিস্থিতিতেই নিজের অস্তিত্বের মহিমা ঘোষণা করতে পারে, মূলনিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণতায় তার আস্বাদন কোনও প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে না। মূল ভাষা জানা থাকলে, পাঠক বা সমালোচকের মধ্যে মূল কবিতার সঙ্গে অনুবাদকে মিলিয়ে দেখার একটা প্রবণতা জাগাই স্বাভাবিক। সেদিক দিয়ে রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়ামের ইংরেজী অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিট্‌জেরাল্ড ও চীনা কবিতার ইংরেজী অনুবাদক আর্থার ওয়েলির ভাগ্য অনেক ভালো; তাঁদের অনুবাদের মূল ভাষাদুটি সাধারণভাবে পাঠক-সমালোচকের না জানাই স্বাভাবিক। তবু তাঁরাও নিস্তার পান নি। যেমন অনুবাদের শিল্প-সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত একটি বইতে[৭] ফিট্‌জেরাল্ডের রুবাইয়াৎ অফ্‌ ওমর খৈয়ামকে 'Pseudo-translation'-রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কবিতা অনুবাদের সার্থকতা-অসার্থকতা বিচারে পাঠক বা সমালোচক অনুবাদে মূল কবিতার বিচ্ছিন্ন শব্দ বা শব্দ-বন্ধের অর্থগত বিচ্যুতির ওপর জোর না দিয়ে, প্রসঙ্গ, প্রকরণ, মেজাজ ও অভিঘাতের সামগ্রিক বিচারে প্রবৃত্ত হবেন, এটাই প্রত্যাশিত। তবে অনেক কবিতা-অনুবাদেই সামগ্রিক ব্যর্থতা অংশে বিধৃত হয়; অংশের ব্যর্থতা সামগ্রিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করে।

'সংবর্ত' কাব্যের নতুন সংস্করণের 'মুখবন্ধ'-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছিলেন: "...মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অভিষ্ট:'। সেই থেকে সুধীন্দ্রনাথ মালার্মে পন্থী—এমন কথা বড়ো বেশি উচ্চারিত হয়ে চলেছে। অথচ মালার্মে

ও সুধীন্দ্রনাথের কবিতা-সম্পর্কিত আদর্শ ও অন্বেষণে বিরোধ নিতান্ত কম ছিল না। মালার্মের ছিল শব্দশিল্পের শুদ্ধতার সাধনা; কোনও বক্তব্য পরিবেশন তাঁর লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বক্তব্যপ্রধান। রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে[৮] তিনি লিখেছিলেন: '...আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ Lyricism নয়, intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে।' মালার্মে প্রচলিত সাধারণ শব্দকেই শুদ্ধতার ব্যঞ্জনায় তুলে নিতে চেয়েছিলেন, অথচ সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখি গম্ভীর তৎসম শব্দের সমারোহ, আর অনেক সময়ই তিনি অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের শরণ নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতেই তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন: '...অসাধারণ চিন্তার অভিব্যক্তিতে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার প্রশস্ত: কেননা এই ধরনের শব্দ মানব মনের অলস-গমনের প্রতিবন্ধক।' কাব্যভাবনায় এই প্রকট পার্থক্য সুধীন্দ্রনাথের মালার্মের কবিতা-অনুবাদকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মালার্মের 'L' Azur'-এর সুধীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ 'নীলিমা'-র কথাই ধরা যাক। এর প্রথম স্তবকের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি রয়েছে:

De l'éternel azur la sereine ironie
Accable, belle indolemment comme les fleurs.

সুধীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন:

নিরপেক্ষ নীলিমার নির্বিকার, নির্মল বিদ্রূপ,
মদালস পুষ্প যেন, সাংঘাতিক সৌন্দর্য ছড়ায়:

প্রথম পঙ্‌ক্তির প্রকট অনুপ্রাসের স্থূলতায় এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'সাংঘাতিক' বিশেষণের সোচ্চার অপপ্রয়োগে সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মূল কাব্যোচ্চারণের প্রশান্ত গাম্ভীর্য-মহিমা ক্ষুণ্ণ করে ফেলেছেন। ঐ একই কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি হল:

Il roule par la brume, ancien et traverse
Ta native agonie ainsi qu'un glaive sür;

সুধীন্দ্রনাথ এর অনুবাদ করেছেন:

কুয়াশার অন্তরালে চক্রবর্তী, প্রাগৈতিহাসিক,
সে মাপে আমার মৌল বিবিক্তির কণ্টকিত সীমা।

প্রথম পঙ্‌ক্তিটিতে 'ancien' শব্দের রূপান্তর সুধীন্দ্রনাথ করেছেন 'প্রাগৈতিহাসিক'। ঐ একই পঙ্‌ক্তির 'অন্তরালে' ও 'চক্রবর্তী' শব্দদুটির প্রয়োগে, অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীনতাগ্রহণ বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে একে যদি বা মেনে নেওয়া যায়, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'সে মাপে আমার মৌল বিভিক্তির কণ্টকিত সীমা'-কে কোনক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। মূল থেকে অনুবাদকের বিচ্যুতি এখানে ঔচিত্যের সীমা নিদারুণভাবে লঙ্ঘন করেছে, যার ফলে মালার্মের মূল কবিতার ঐ দুটি পঙ্‌ক্তিতে উদ্‌ভাসিত বাক্‌প্রতিমাটি ও ঐ শেষ স্তবকটির ভাবগৌরব ও শিল্পসৌন্দর্য একেবারেই বিনষ্ট হয়েছে।

এজরা পাউণ্ডের 'Ballad For G!oom' কবিতার বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদ 'বিষাদ-গাথা'-কে ব্যর্থ বলেই গণ্য করতে হবে, কারণ এতে মূল কবিতার ভাববস্তু, মেজাজ ও চলন বিশেষভাবে বিপর্যস্ত। মূল কবিতায় God শব্দটি বহুবার আবৃত্ত, অনুবাদে কোথাও এর যথাযথ বাংলা রূপ নেই; সর্বত্র ঐ বিশেষ্যটির জায়গা নিয়েছে প্রথম পুরুষ-বোধক সর্বনাম। এতে মূলের বক্তব্যের জোর অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। অন্যত্রও রূপান্তরে অনুবাদক যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিয়েছেন। মূলের—

I have loved my God as a child at heart
That seeketh deep bosoms for rest,
I have loved my God as a maid to man.—

অনুবাদে দাঁড়িয়েছে :

আমার মন একলা শুয়ে ডাকলো কত
শিশু যেমন ঘুমের সময়,
আমার প্রাণ খুঁজলো তারে সমস্ত রাত—
প্রেমিক হাত সে কি ঘুমোয়।

মূলের তিন পঙ্‌ক্তি অনুবাদে হয়েছে চার পঙ্‌ক্তি। মূলের প্রতিটি পঙ্‌ক্তিরই ভাববৈশিষ্ট্য অনুবাদে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। 'একলা শুয়ে ডাকলো কত', 'প্রেমিক হাত সে কি ঘুমোয়' অনুবাদকের অকারণ সংযোজন বলেই গণ্য করতে হবে। মূলে যেখানে রয়েছে—

I have played with God for a woman,
I have staked with my God for truth,
I have lost to my God as a man, clear-eyed—
His dice be not of ruth.

অনুবাদে সেখানে পড়ি—

প্রেমের খেলা খেলেছি কত বার,
ছুঁড়েছি পাশা সত্য ক'রে পণ,
স্বচ্ছ চোখে হেরেছি তার কাছে
ব্যথার পূজা করিনি নিবেদন।

মূলের প্রথম পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য, শব্দবর্জনে ও শব্দপ্রয়োগের ত্রুটিতে, অনুবাদে একেবারে ফিকে হয়ে গেছে। আর 'His dice be not of ruth'-এর রূপান্তর বাচ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ কোনও দিক দিয়েই তার ধারে-কাছে পৌঁছোয় নি। বস্তুতঃ 'ব্যথার পূজা করিনি নিবেদন'-কে অনুবাদকের অকারণ স্বযোজিত পঙ্‌ক্তি বলেই গণ্য করতে হয়। মূলের 'For I am made as a naked blade'-এর রূপান্তর করেছেন অনুবাদক—'বাকি কিছুই নেই তো আর, লাকিয়ে উঠি নগ্ন ধার'; মূলের 'I have drawn my blade where the lightnings meet'—অনুবাদে হয়েছে 'বিদ্যুতের লাল আগুন ছুঁড়েও দেখি'। এখানেও দেখি অনুবাদকের স্ব-যোজিত শব্দের অপপ্রবেশ, মূলের তাৎপর্যের বিকৃতি, ভাব ও ভঙ্গীর ঐশ্বর্যের খর্বতা। 'বাকি কিছুই নেই তো আর'—অনুবাদকের সম্পূর্ণ নিজস্ব সংযোজন; 'For I am made' ও 'লাকিয়ে উঠি'-র মধ্যে কোনও দূরতম যোগও নেই। আবার 'I have drawn my blade'—অংশটিকে অনুবাদে উপেক্ষা করা হয়েছে; 'where the lightnings meet'-এর শুধু 'lightnings'-এর ভাষান্তর 'বিদ্যুৎ' শব্দটিকে রেখে, বাকি অংশটিকে বদলে নিয়েও একাধিক শব্দের সংযোজনে সম্প্রসারিত ক'রে 'বিদ্যুতের লাল আগুন ছুঁড়েও দেখি'-তে দাঁড় করানো হয়েছে।

এলিঅটের কবিতার অনুবাদে বিষ্ণু দে সময়ে সময়ে এমন স্বাধীনতা নিয়ে ফেলেছেন, মূলের ভাবাবহ ও তাৎপর্যের এমন বদল ঘটিয়েছেন যে অনুবাদের প্রয়োজনবোধ ও শিল্পসার্থকতা, উভয় প্রেক্ষিতেই তার ঔচিত্য আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। এলিঅটের 'Gerontion' রূপান্তর 'জরায়ণ'-এ[৯] বিষ্ণু দে মূলের নিসর্গপট ও আবহকে একেবারে উল্‌টিয়ে দিয়েছেন। মূলের—

Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.
I was neither at the hot gates
Nor fought in the warm rain

—অনুবাদে হয়েছে :

এই তো রয়েছি এক বুড়ো, ভিজে ভাদুরে বাদলে
নাতি প'ড়ে খবর শোনায়, রৌদ্রের আশায়।
আশ্রমে আমি তো কোনো খাদির খামারে হাঁকিনিকো দর,
লড়িনি পশ্চিমা রৌদ্রে,

আর, মূলের—

Tenants of the house,
Thoughts of a dry brain in a dry season.

—রূপান্তরিত হয়েছে :

ঘরে ঘরে ভাড়াটেরা,
এ ভরা বাদরে ভিজা মাথায় চিন্তারা
আমারও হৃদয়। —এইভাবে।

'I was neither at the hot gates'-এর 'আশ্রমে আমি তো কোনো খাদির খামারে হাঁকিনিকো দর'—এমন অযথা দূরান্বয়ী রূপান্তর এবং শেষ দু পঙ্‌ক্তির 'আমারও হৃদয়'-এর ক্লিষ্ট সংযোজনে তিন পঙ্‌ক্তিতে পল্লবিতকরণের চেয়ে আমাদের কানে অনেক বেশি আপত্তিকর হয়ে ওঠে, আমাদের আস্বাদন, উপলব্ধি ও প্রত্যয়কে অনেক বেশি ব্যাহত করে, 'in a dry month'-এর 'ভিজে ভাদুরে বাদলে'-তে, 'waiting for rain'-এর 'রৌদ্রের আশায়'-তে, 'in the warm rain'-এর 'পশ্চিমা রৌদ্রে'-তে, 'a dry brain in a dry season'-এর 'এ ভরা বাদরে ভিজা মাথায়'-তে রূপান্তর। অনুবাদের প্রয়োজনে মূলের নিসর্গ-পরিবেষ্টনকে এইভাবে বিপর্যস্ত ক'রে দেওয়ার সার্থকতা কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না। এদেশে খরার অভিজ্ঞতা কি এতই অজানা-অচেনা?

অনুবাদে মূল কবিতার বিদেশী চিত্রকল্প, উল্লেখ ইত্যাদির স্বদেশীয়করণের কথা কেউ কেউ বলেছেন এবং এই আদর্শ কোন কোন অনুবাদক তাঁদের অনুবাদকর্মে রূপায়িতও করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'প্রতিধ্বনি'-র 'ভূমিকা'য় সুধীন্দ্রনাথের অভিমত ও নির্দেশ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে বিদেশী কবিতার আক্ষরিক তর্জমা বা ছন্দের দিক থেকে যথাযথ অনুকরণের চেষ্টা 'আসলে অনর্থের বিড়ম্বনা' এবং অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই তিনি বুঝিয়েছিলেন 'যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধি-নিষেধ অকাট্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপার্বিকের একান্তর

ঝোঁক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয়; আমাদের কানে ভালো না লাগলে, তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক; এবং চিত্রকল্পের বেলাতেও মাছি-মারা কেরাণী রসাভাস ঘটায়, অভীষ্ট আবেগ জাগিয়ে, দর্শকের সাধুবাদ পায় না।'—কিন্তু এ ব্যাপারেও আতিশয্য অবশ্যই পরিহার্য, তাই 'যীশুর জীবনী লিখতে এখন যেমন অনূদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনই অনাবশ্যক ক্রীস্মাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার, এবং তার পরে এমন একটা সাধারণ নিয়ম হয়তো গ্রাহ্য যে ভাবচ্ছবির তারতম্যেও অভিপ্রায় যেখানে বদলায় না, সেখানেই পরিচিত, বা সার্বভৌম, প্রতীক প্রয়োজ্য, অন্যত্র নয়।' হাইনের কবিতার অনুবাদ 'পরিবাদ'-এ সুধীন্দ্রনাথ নিজেই এই স্বদেশীকরণের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তবে বিষ্ণু দে-র এলিঅটের কবিতা-অনুবাদেই এই স্বদেশীয়করণের বিচিত্র ও ব্যাপক প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এলিঅটের 'Gerontion' কবিতার অনুবাদ 'জরায়ণ'-এ বিষ্ণু দে যখন মূলের—

And the jew squats on the window sill, the owner,
Spawned in some estaminet of Ant werp,
Blistered in Brussels, patched and peeled in London'.

—এর অনুবাদ করেন :

ওদিকে মালিক ব'সে জানালার কিনারে ঐ মারবারী,
জন্ম তার বনারসে কোন্ ঘাটের কাদায়,
কানপুরে তেতেছে সে, মেতেছে সে কলকাতায়।

—এবং মূলের—

In depraved May, dogwood and chestnut, flowering judas,
To be eaten, to be divided, to be drunk,
Among whispers; by Mr. Silvero
With caressing hands, at Limoges
Who walked all night in the next room;
By Hakagawa, bowing among the Titians;
By Madame de Tornquist, in the dark room
Shifting the candles; Fraülein von kulp
Who turned in the hall, one hand on the door···

—এর অনুবাদ করেন ;

পচা ভাদ্রে, কচুশাক, কালোজাম, মোহিনী ধুতুরা
চবা, চোয়া, বিভাজ্য ও পেয়
গোপন ফিসফাসে, তাই জোটে হাতিলাল মেহতা
কোমল পেলব হাতে, আহমেদাবাদে যেবা
পায়চারি করেছিল সারা রাত পাশের কামরায় ;
জোটে তাই কালচাঁদ প্রাণোলিয়া বেলোয়ারি ঝাড়ের তলায় ;
মৃত্যে গৃহিনী জোটে অন্ধকার ঘরে
বাতি নাড়ে আগে পরে পরে আর আগে ; জোটে
মিস্টার তরফদার বেলেঘাটা হলের চৌকাঠে ; এক হাত দ্বারে।

—তখন এই ধরনের ব্যক্তি, স্থান, ঋতু ও মাসের নাম পরিবর্তনে মূল কবিতার অভিপ্রায় ও অভিঘাত তেমন পাল্টে যায় না বা ক্ষুণ্ণ হয় না ব'লে অনুবাদ সম্বন্ধে আমাদের মনে আপত্তি জেগে ওঠে না। এই একই কবিতার অনুবাদে বিষ্ণু দে যখন বিদেশী পৌরাণিক প্রসঙ্গের আমূল স্বদেশীয়করণ করেন :

Signs are taken for wonders, 'We would see a sign !'
The word within a word, unable to speak a word,
Swaddled with darkness. In the juvescence of the year
Came Christ the tiger.—কে বদ্‌লে দেন ও বিস্তারিত করেন,

'আবির্ভাব শেষটা দাঁড়ায় আশ্চর্য ঘটনা /
আমরা সবাই চাই আবির্ভাব
দর্শন, দর্শন, জন্মাষ্টমী !
শব্দের মাঝারে শব্দ, বুদ্ধবাক্, অপরাগ শব্দ উচ্চারিতে,
কাংস্য অন্ধকার কাঁথায় জড়ানো ; স্বাধীন পরবে নবযুগের উদ্‌গমে
এল কৃষ্ণ নরসিংহ

পাঞ্চজন্যে কেশরীহুঙ্কারে, বংশীরবে'—এখন অনুবাদে, তখন 'জন্মাষ্টমী'-র আরোপে, 'ক্রাইস্ট'-এর বদলে 'কৃষ্ণ' ও 'টাইগার'-এর চিত্রকল্প পাল্টে 'নরসিংহ' চলে আসায় মূলের অভিপ্রায় ও অভিঘাত পাল্টে গিয়ে মূল থেকে বিচ্যুতির অনুভব জেগে ওঠে। এলিঅটের কবিতাপর্যায় 'Ash-Wednesday'-কে বিষ্ণু দে রূপান্তরিত করেছেন 'চড়কের গান'[৬০]-এ উপবাস ও অনুতাপের জন্য নির্ধারিত Lent নামে অভিহিত খ্রীষ্টীয় পর্বের প্রথম দিনটিকে, বর্ষচক্র ঘুরে বর্ষশেষ ও

নববর্ষারম্ভের রূপকস্বরূপ চৈত্রসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শৈব উৎসববিশেষে এই রূপান্তর —ভাবাবহ, অভিপ্রায় ও তাৎপর্যের দিক দিয়ে স্পষ্টতই উচিত্যবিরোধী ব'লে বোধ হয়। ফলতঃ বিদেশী ধর্মীয় প্রসঙ্গের এই স্বদেশীয়করণের ফলে বিষ্ণু দে-র অনুবাদে গুরুতর অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। মূলের—

.....and because
She honours the Virgin in meditation,
We shine with brightness. [Ash-Wednesday II]

অনুবাদে হ'য়ে দাঁড়ায়—

এবং যেহেতু তিনি
দেবকীমাতাকে ধ্যানে করেন সম্মান, তাই
আমরা পেয়েছি দ্যুতি। [চড়কের গান (২)]—এবং

Going in white and blue, in Mary's colour,
Talking of trivial things
In ignorance and in knowledge of eternal dolour
[Ash-Wednesday IV]

—মূলের এই অংশের বিষ্ণু দে অনুবাদ করেন :

কে ও যায় শুভ্রে নীলে শ্রীরাধার নীলাম্বরে
তুচ্ছ কত বিষয়ের কথা ব'লে ব'লে
চিরন্তন মাথুরের অজ্ঞান ও জ্ঞানের আখরে
[চড়কের গান (৪)]

Virgin ও Mary এলিঅটের মূল কবিতায় খ্রীষ্টীয় পর্ব-নির্দেশক শিরোনামের তলায় খুব সহজ স্বাভাবিকতাতেই চলে আসেন, কিন্তু বাঙালী অনুবাদক তাঁর রূপান্তরে শৈব উৎসব-নির্দেশক শিরোনামের তলায় বৈষ্ণব অনুষঙ্গ আনেন কোন্ কাব্যিক সঙ্গতিবোধে ? আবার Virgin-এর বঙ্গীয়করণ করতে গিয়ে তিনি কৃষ্ণের দুই মাতা দেবকী ও যশোদার মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে অগত্যা দেবকীকেই বেছে নেন এবং অনিবার্যত বিপাকে পড়েন। দেবকী তো নিতান্তই কৃষ্ণের গর্ভধারিণী, কুমারী মাতার সঙ্গে যীশুর গভীর সম্পর্ক তো যশোদাকেই স্মরণ করায়। অনুবাদে এই অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি একই কবিতা পর্যায়ের রূপান্তরে অন্যত্রও দেখা দিয়েছে।

Desiring this man's gift and that man's scope
I no longer strive to strive towards such things
(Why should the age'd eagle stretch its wings ?)
[Ash-Wednesday I]

—এই সাধারণ বিবৃতির অনুবাদে বিষ্ণু দে অযথা মহাভারত-রামায়ণের প্রসঙ্গ আরোপ করেন :

এর ইন্দ্রগ্রন্থ চেয়ে, চেয়ে ওর পাশা
সাধ্যের সাধনে সব করিনাকো সাধ

(বৃদ্ধ জটায়ুর পাখা আর কেন উড়বে অবাধ ?) [চড়কের গান (১)]

—ফলে একই কবিতার অনুবাদে, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রসঙ্গ, মহাভারত-রামায়ণের পুরাণকাহিনী সব কিছু জড়িয়ে এক দুর্মোচ্য জট পাকিয়ে যায়।

আবার— Lord, I am not worthy
Lord, I am not worthy

But speak the word only.

[Ash-Wednesday III]

—এই অংশের অনুবাদে :

প্রভু, আমি যোগ্য নই
প্রভু, আমি যোগ্য নই

তবুও শোনাও তব গীতা ॥ [চড়কের গান (৩)]

—'প্রভু' ও 'গীতা', যথাক্রমে খ্রীষ্টীয় ও হিন্দু অনুষঙ্গ-জড়িত এই দুই শব্দের অনিবার্য বিরোধ মূলের অভিপ্রায় ও অভিঘাতকে খণ্ডিত ক'রে দেয়।

পদ্যছন্দের কবিতা অনুবাদে পদ্যছন্দের কবিতাতেই রূপান্তরিত করতে গেলে অনুবাদককে স্বভাবতই উদ্‌ভাবন-সামর্থ্য ও রূপায়ণ-নৈপুণ্যের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। পদ্যছন্দের বন্ধন-স্বীকার তাঁর শব্দ-চয়নের স্বাধীনতাকে অনেকখানি সীমায়িত করে ফেলে ; ফলে মূল কবিতার ভাব প্রকাশের উপযোগী যথাযথ শব্দগুলি অনেক সময়েই তিনি তাঁর অনুবাদে প্রয়োগ করতে পারেন না। এই অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে অনেকেই প্রস্তাব করেছেন, যে মূল কবিতার ভাববস্তু ও অভিপ্রায়কে অনুবাদে সঠিকভাবে উপস্থিত করতে হলে অনুবাদে পদ্য নয় গদ্য ব্যবহারই যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু গদ্য ও পদ্যের স্বভাব-বৈষম্য অস্বীকার করার নয়। আমাদের প্রাত্যহিক দিনযাপন, তার তুচ্ছ গতানুগতিক অনেক কৃত্যের, অভ্যাসক্লিষ্ট প্রয়োজনের, সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িয়ে আছে গদ্য। পদ্যে রচিত কবিতার গদ্য-রূপান্তরে তাই মূল কবিতার অপার্থিব সৌন্দর্য-রহস্যের বিস্ময়বোধ দ্যুতিহীন হয়ে

যাওয়ার, বচনাতীতের ইশারা হারিয়ে যাওয়ার সম্যক্ সম্ভাবনা রয়েছে ; পদ্যে রচিত কবিতার অনুবাদ পদ্যে করলে তার কিছুটা ধরে দেওয়া অন্ততঃ সম্ভব হয়। বস্তুত পদ্যছন্দে গ্রথিত একটি কবিতার সজীব স্পন্দিত প্রতিধ্বনি শুধু একটি পদ্যছন্দের কবিতাতেই পাওয়া সম্ভব। তীব্র আবেগ, বর্ণিল কল্পনা, ইন্দ্রিয়-সংবেদী বাক্-প্রতিমা, মোহময় ধ্বনিস্পন্দন, অমর্ত্য শব্দ-সঙ্গীত, ভাষার বহুস্তরী দ্যোতনা—এসব গদ্যে যেন ঠিক আধারিত হতে চায় না। তাই একটি কবিতা অনুবাদেও যথাসম্ভব কাব্যগুণান্বিত হোক, কবিতা হিসেবেই প্রাণময় হোক, কবিতা রূপেই বিচার্য হোক—এমন প্রত্যাশা থাকলে, পদ্যছন্দে রচিত কবিতার অনুবাদে গদ্য পরিত্যাজ্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য সব শ্রেণীর কবিতাই এই গদ্য-রূপান্তরে সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি'-র মতো মৌখিক মহাকাব্য বা ভার্জিলের 'ঈনীড'-এর মতো লিখিত মহাকাব্য—যার মেরুদণ্ডস্বরূপ রয়েছে বিশাল স্মরণীয় ঘটনাবলীর বিবরণ প্রদানে আকর্ষক এক কাহিনী—গদ্যরূপান্তরে স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে কম। বস্তুত হোমারের মহাকাব্যের মতো রচনার অনুবাদে পদ্যের চেয়ে গদ্যকেই অধিকতর উপযোগী বাহন মনে করেছেন গ্যেটে থেকে রবার্ট গ্রেভ্‌স্ পর্যন্ত অনেকেই। যাই হোক, এই গদ্য-রূপান্তরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিমুখ্য গীতিকবিতার এবং 'গীতি-কবিতা' অভিধানটিকে ব্যাপক ক'রে নিয়ে দ্যোতনাজটিল আধুনিক কবিতাকেও এর মধ্যে ঠাঁই দেওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে বিদগ্ধ সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যপাঠকদের প্রবল আগ্রহের যে দ্রুত ক্ষয় আমরা বেদনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছি, তার একটা প্রধান কারণ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, তার অসামান্য ছন্দ ও মিলের গৌরবচ্যুত হয়ে গদ্যে আশ্রিত হয়েছিল। ক্ষুব্ধ, শ্রান্ত, দ্বন্দ্ব-মথিত প্রতীচ্য কিছুকালের জন্য রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ভাববস্তুর নতুনত্বে বুঁদ হয়ে শান্তি খুঁজেছিল ; শ্রান্তিহারক অভিনবত্বের সে মোহ টুটে যাবার পর নিছক কবিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কবিতাকে বিচার ক'রে, তাতে নিজেদের সৌন্দর্যচেতনা ও রূপবোধ তৃপ্ত হবার মতো বিশেষ কিছু প্রতীচ্যের সাহিত্যস্রষ্টা ও সাহিত্যরসিকরা পেলেন না। হ্যারিয়েট্ মনরোকে লেখা চিঠিতে এজরা পাউণ্ডের উক্তি[৬১] স্মরণীয় : 'যতক্ষণ তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কবিতাকে আশ্রয় ক'রে থাকেন, ততক্ষণ যারা তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভিন্নমত, তাদের বিরুদ্ধে রীতিগত যুক্তিতে তাঁকে সমর্থন করা চলতে পারে। এবং বেদসমূহ ও অন্যান্য যা কিছু অনূদিত হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি ক'রে তাঁর পক্ষে লাভ নেই।

তাঁর মূল বাংলা ভাষায় তাঁর ছন্দ ও মিলের এবং প্রকাশভঙ্গীর অভিনবত্ব রয়েছে, কিন্তু একটি গদ্য অনুবাদে তা সঠিকভাবে "নিছক অধ্যাত্মতত্ত্ব" ("mere theosophy")। যাই হোক সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, পদ্যরচিত কবিতার অনুবাদে, বিশেষ ক'রে গীতিকবিতা শ্রেণীর কবিতা-অনুবাদে, অনূদিত কবিতার পাশাপাশি গদ্য-রূপান্তর থাকলে অবশ্যই সুবিধা হয়, কিন্তু তা বলে ঐ কবিতার অনুবাদ একেবারেই পদ্যে না করে নিছক গদ্যে হাজির করলে মূলের অভিপ্রায়, অভিঘাত, রসোৎকর্ষ থেকে অনেকখানি বঞ্চিতই হতে হবে। জর্জ স্টেইনারের অভিমত [৬২] অনুসরণ ক'রে বলা যায়ঃ একটি সজীব কবিতার নবোকভ-উক্ত 'বেচপ আক্ষরিক অনুবাদ' বা 'ক্লাম্‌জি লিটারাল ট্রানস্লেশন' কোনও অনুবাদই নয়; একটি গদ্য-রূপান্তর বা গদ্য-ভাবব্যাখ্যান বড় জোর একটি প্রণিধানযোগ্য সহায়ক, তার বেশি কিছু নয়। একটি কবিতার পরিবর্তে আর একটি কবিতাকে পেতে হলে নিঃসংশয়ে পদ্যরূপেরই মুখ চাইতে হবে।

একটি সফল কবিতা-অনুবাদের রচয়িতা তাঁর সময়ের স্ব-ভাষার কাব্যপাঠকদের কবিতা-সম্পর্কিত নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার প্রত্যাশা কিয়দংশে পূরণ করেন। এমনও বলা যায় ঐ অনুবাদের ভাব ও রীতি ঐ পাঠকদের রুচি ও মানসতা দ্বারা কমবেশি চালিত হয়ে থাকে। আর সেই কারণেই মৌলিক কবিতার তুলনায় অনুবাদ-কবিতা অনেক দ্রুত সময়-স্পৃষ্ট, অনুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই কবিতা-অনুবাদককে তাঁর অনুবাদের প্রবলতর জীবনী-শক্তি, দীর্ঘতর স্থায়িত্বের জন্য, ঐ অনুবাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র, অস্তিত্বের কথা ভাবতে হয়। আর তখন তিনি বুঝতে পারেন যে মূল কবিতার ভাববস্তু, রূপকল্প ও মেজাজের আভাস বহন করেও তাঁর অনুবাদকে পরিণামে হয়ে উঠতে হবে, একটি সমান্তর কাব্যরূপ, একটি কবিতার বদলে আর একটি কবিতা; ভিন্নভাষার কবিতার প্রসঙ্গ, প্রকরণ ও আবহের সংক্রাম ছাড়া যার বর্তমান অস্তিত্ব সম্ভব হয়ে উঠত না অথচ যা সামগ্রিক অভিঘাতে পুনরুপস্থাপন নয়, পুনঃসৃষ্টি। এই প্রেক্ষিতেই এজরা পাউণ্ডের কবিতা-অনুবাদ সম্বন্ধে টি. এস. এলিঅটের এই অনুধাবন তীক্ষ্ণ তাৎপর্য-চ্ছুরিত হয়ে ওঠেঃ "আমি সন্দেহ করি যে, প্রত্যেক যুগের অনুবাদ-সম্পর্কিত একই বিভ্রম ছিল ও থাকবে যা আদৌ বিভ্রম নয়। যখন একজন বিদেশী কবিকে আমাদের নিজের ভাষা ও নিজের কালের বাক্‌রীতিতে সার্থকভাবে রূপায়িত করা হয়, তখনই আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি 'অনূদিত' হয়েছেন; আমরা বিশ্বাস করি যে এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে আমরা সত্যিই অবশেষে মূলকে পেলাম। এলিজাবেথীয়রা নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে তাঁরা

চ্যাপম্যানের মধ্য দিয়ে হোমারকে পেলেন, নর্থের মধ্য দিয়ে পেলেন প্লুটার্ককে। এলিজাবেথীয় না হওয়ায় আমাদের ঐ বিভ্রম নেই; আমরা দেখি চ্যাপম্যান হোমারের চেয়ে বেশি চ্যাপম্যান, এবং নর্থ প্লুটার্কের চেয়ে বেশি নর্থ।..... পাউণ্ডের ওপরও একই ভাগ্য ঝুঁকে আছে।...আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে আগামী তিনশো বছরে পাউণ্ডের ক্যান্টো হবে একটি 'উইণ্ডসর অনুবাদ' যেমন চ্যাপম্যান ও নর্থ এখন 'টিউডর অনুবাদ'ঃ তা একটি 'অনুবাদ'-এর চেয়ে বরং (এবং ন্যায্যতই) 'বিংশ শতকীয় কবিতার' একটি 'আশ্চর্য নমুনা' বলে কথিত হবে।"[৬৩]

নির্দেশপঞ্জি

১. Hartcrane—General aims and theories—From Hart Crane: The Life of an American Poet by Philips Horton—Modern Poets on Modern Poetry Edited by James Scully—Collins the Fontana Library Pp. 164.

২. William Empson—Seven types of Ambiguity Peregrine books I pp 1

৩. Dylan Thomas—Notes on the art of Poetry—Modern Poets on Modern Poetry Edited by James Scully—Collins the Fontana Library Pp. 202.

৪. "All translating seems to me simply an attempt to accomplish an impossible task."—A. W. V Schlegel-এর কাছে ২৩শে জুলাই, ১৭৯৬ তে Wilhelm v. Humboldt-এর লেখা চিঠি।

৫. Letters of Sri Aurobindo (On Poetry and Literature) Third series.

৬. Approaches to the Problem—The Added Artificer—Renato Poggioli—On Translation—Reuben A. Brower Editor A Galaxy book New York Oxford University Press 1966.

৭. On Linguistic Aspects of Translation Roman Jakobson—On Translation—Reuben A. Brower Editor.

৮. 'পেঙ্গুলাম' কাব্যগ্রন্থ—পরেশ মণ্ডল।

৯. Moral Principles in Translation—By Robert Graves—Encounter edited by Stephen Spender & Melvin J. Lasky April 1965 Vol. XXIV No 4.

১০. রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র—আনিসুজ্জামান দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৬

১১. Writing—Selected Essays—W. H. Auden—Faber and Faber.

১২. How to Read Part II Language—Literary Essays of Ezra Pound Edited with an Introduction by T. S. Eliot Faber and Faber Limited.

১৩. The Three Voices of Poetry (1953)—On Poetry and Poets by T. S. Eliot—Faber and Faber Limited.

১৪. Translating From the German—Edwin Muir and Willa Muir—On Translation—Reuben A. Brower Editor.

১৫. "The Renaissance : translation"—The classical Tradition,—Gilbert Highet.

১৬. T. S. Eliot—Introduction : 1928—Ezra Pound-Selected Poems Faber and Faber.

১৭. কবিতার শত্রু ও মিত্র—বুদ্ধদেব বসু—এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড—পৃ° ৬৩—পৃ°৬৪

১৮. ঐ পৃ°৬৪-পৃ°৬৫

১৯. ঐ পৃ°৫৯

২০. ঐ পৃ°৬২ – পৃ°৬৩

২১. ঐ পৃ°৬১

২২. H. A. Mason—'The women of Trachis and Creative Translation', Arion, vol. 2, 1963 (revised version, Cambridge Quarterly, vol. 4, 1969 – Ezra Pound A Critical Anthology Edited by J. P. Sullivan Penguin Books.

২৩. Introduction Selected Poems Rilke Translated with an Introduction by J. B. Leishman Penguin Books.

২৪. On Translating with Borges—Norman Thomas di Giovanni Encounter Edited by Melvin J Lasky and Nigel Dennis April 1969 vo'. XXXII No. 4.

২৫. প্রতিধ্বনি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—সিগনেট প্রেস

২৬. ঐ

২৭. The Task of the Translator—Walter Benjamin—Illuminations—Edited and with an Introduction by Hannah Arendt Translated by Harry Zohn—Fontana/Collins.

২৮. The dore Savory—The Art of Translation—IV. The Principles of translation—Jonathan cape Paperback Edition Fiast Published 1969.

২৯. T. F. Higham—Oxford book of Greek Verse in translation—Preface. 1938

৩০. Aesthetic translated by Douglas Ainslie.

৩১. Vladimir Nabokov—Problems of translation ; Onegin in English." Partis an Raview 22,496 – 512.

৩২. John Dryden—Preface to Ovid. Epistles—Essays, edited by W. P. Ker.

৩৩. Approaches to the Problem the Added Artificer—Renato Poggioli—On Translation Reuben A. Brower Editor

৩৪. ঐ

৩৫. Introduction . 1928—Ezra Pound Selected Poems—Edited with an introduction by T. S. Eliot—Faber and Faber.

৩৬. Robert Lowell : An Interview—Writers at work : The Paris Review Interviews, Second Series ed. by Malcolm cowley.—Modern Poets on Modern Poetry Edited by James Scully-তে পুণর্মুদ্রিত

৩৭. Practical Notes on translating Greek Poetry Richmond Lattimore—On Translation Reuben A. Brower, Editor.

৩৮. H. A. Mason—'The women of Trachis and Creative Translation'—Ezra Pound A Critical Anthology Edited by J. P. Sullivan Penguin Books.

৩৯. Moral Principles in Translation—By Rabert Graves—Encounter edited by Stephen Spender & Melvin J. Lasky April 1965 Vol. XXIV No. 4.

৪০. 160 : To A. R. Orage—The Selected Lettets of Ezra Pound 1907-1941 Edited by D. D. Paige, Faber and Faber, London.

৪১. 189 : To Felix E. Schelling—ঐ

৪২. Versions, Interpretations, and Performances - John Hollander—On Translation Reuben A. Brower, Editor.

৪৩. Introduction Poem into Poem World Poetry in Modern Verse Translation—Edited by George Steiner Penguin Books.

৪৪. Abuse of Privilege : Lowell as Translator—John Simon —Hudson Review winter 1967-'68.

৪৫. অমিয় চক্রবর্তী—রূপকল্প প্রসঙ্গে : সম্পাদককে লেখা চিঠি, কবি ও কবিতা তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, বাইশে শ্রাবণ : ১৩৭৫।

৪৬. Some Reflections on the Difficulty of Translation—Achilles Fang—On translation Reuben A. Brower, Editor.

৪৭. 295 : To W. H. D. Rouse—The Selected Letters of Ezra Pound 1907-1941 Edited by D. D. Paige Faber and Faber London.

৪৮. 297 : To W. H. D. Rouse—ঐ

৪৯. Euripides and Professor Murray—The Sacred Wood by T. S. Eliot—Methueu London.

৫০. 'অনুবাদকের বক্তব্য'—হেল্ডার্লিন-এর কবিতা অনুবাদ ভূমিকা ও টীকা এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড পৃ° ২৭।

৫১. 'কবিতা বিষয়ক আলোচনা'—গাঙ্গেয় পত্র পঞ্চম সংকলন শ্রাবণ ১৩৮৪ আগস্ট ১৯৭৭

৫২. John Ciardi—'Strictness and faithfulness' Nation 178 : 525—Review of Filts's Lysistrata and Marianne Moore's La Fontaine.

৫৩. The Poetic Nuance—Dudley Fitts—On Trans'ation-Reuben A. Brower, Editor.

৫৪. বিষ্ণু দে অনূদিত এলিঅটের কবিতা সিগনেট প্রেস কলকাতা ২৩—তৃতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৭৬

৫৫. Second thoughts—M. R. Ridley—2 Translations—J. M. Dent & Sons Ltd.

৫৬. Third Thoughts on Translating Poetry—Jackson Mathews—On Translation Reuben A. Brower Editor.

৫৭. Theodore Savory the Art of Translation Jonathan Cape Paperback Edition.

৫৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের চিঠি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে [১]—দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯

৫৯. বিষ্ণু দে অনূদিত এলিঅটের কবিতা সিগনেট প্রেস

৬০. ঐ

৬১. 17 : To Harriet Monroe the Selected Letters of Ezra Pound 1907—1941 Edited by D. D. Paige

৬২. Introduction Poem into Poem Edited by George Steiner Penguin Books.

৬৩. Introduction : 1928 Ezra Pound Selected Poems Edited with an introduction by T. S. Eliot—Faber and Faber.

গল্প

বুকের ছবি

সুতপন চট্টোপাধ্যায়

বাস ছেড়ে গেল হাটবসন্তপুরের মোড়। হলুদ থাম হাতে করে বাস থেকে নামল শ্রীধর। ভীড় ঠেলে বাইরে এসেই বটগাছের গুড়িতে হলুদ থামটা নামিয়ে উল্টো করে জামা খুলল দুহাতে। বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল সারা গায়ে। গেঞ্জিটাও খুলে সে কাঁধে ফেলে বলল 'পাঁচ পয়সার বিড়ি—এককাপ চা দেতো—শশী।'

হাটবসন্তপুর মোড়ে বাঁশবনের জটলার ফুঁড়ে হলুদ বাঁশির মতো রোদ। তারমধ্যে শশীর দোকানের নীল ধোঁওয়ার ডিগ্‌বাজী। ব্যাকারীর বেঞ্চিতে দল দল মানুষ। কারো মুখে আবাদের গল্প। কেউ কমদামে পোয়াতি গরুকে কি ভাবে বেচেছে গরুহাটায়। কারো মুখে কাঁচা বাজারের আগুন দরদামের উঠানামা। কেউ সুখ টান দিচ্ছে খালিপেটে। দুএকজন উপরের ফাঁকা নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে। শহুরে ফোঁড়ে এই ফাঁকে দরদাম করে নিচ্ছে। ছাগল, বাছুর ও পোষা মুরগীর। এ ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিচ্ছে। আসলে সবাই একই কথা বারবার বলছে তাই একটা গোলমাল। এরই মধ্যে শশী ট্রানজিস্টারের নব ঘোরাতেই হট্টোগোলের মধ্যে শব্দ হল ডিং-ডং। এক সেকেণ্ডের বিরতি। তারপরই এক সংগে অনেকগুলো যন্ত্র ভেঙে পড়ল রেডিওর ভিতর। মাথায় হলুদ টুপি পরা হরীশ দাবনার উপর চাপড় মেরে চিৎকার করে উঠল 'ম্যায় হুঁ ডন্' ঠিক সেই কথাটাই বিবিধ ভারতীতে বেজে উঠল আরো জোরে। হরীশ শিস দিতে দিতে কোমর দোলাচ্ছে ব্যাকারীর মাচায়। তার পা দুলছে, মাথা নড়ছে, গোটা শরীর কেমন টাল-মাটাল। মাচার উপর এই নাচের চাপে নীচ থেকে শব্দ হল মচ্‌মচ্। শশী চিৎকার করল 'গুন্‌গার দিতে

হবে—ভাঙলে।' শশীর গলা শুনে শ্রীধর তাগাদা দিল 'কিরে কী হল।' এক হাতে চা অন্য হাতে বিড়ি নিয়ে এসে শশী জিজ্ঞাসা করল ওগুলো কি মামা ?—

বুকের ছবি—

কার ?

বৌএর—

বেশী কথা বলতে ইচ্ছে করল না শ্রীধরের। সে বিড়িতে আগুন লাগিয়ে চারপাশটা একবার দেখল। বাকি বিড়িগুলো গুজে রাখল কানের খাঁজে। না—তার গাঁএর এমন কাউকে দেখল না যাকে জিজ্ঞাসা করা যায়। সবাই ব্যস্ত। তাছাড়া কারইবা দায় পড়েছে এই ভর সন্ধ্যে বেলা লোকের বউএর খবর নিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

নিজেকেই বোঝাল শ্রীধর।

সদর শহরে ছবি আনতে যাওয়ার আগে বাজারে চারটে শখের মুরগী বেচেছে সে। বুক পকেটে যা টাকা ছিল, ক্লিনিকে দিয়েও বেশ কিছু ঘামে ভিজে সপসপে। যা ভীড় বাস। ঠেলাঠেলি, মারামারি করে দাঁড়িয়ে এক হাত বুকে চেপে ধরে সারা রাস্তা আসা। কনুইটা বেশ ব্যথা। হাতের উপরের পেশীতে একটা টনটনে ব্যথা জমে উঠেছে। বাঁহাতে বিড়ি টানতেই সেই ব্যথাটা ভিতর থেকে জানান দিল। মাথার চুলে ঘাম শুকোতে শুরু করেছে তাই এখানে সেখানে পিটপিটুনি। দু একটা ঘামাচি নোখের কোনা দিয়ে পট্‌পট্ করে গালল শ্রীধর। কাঁধের দুপাশে। পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে দিল পুকুরের গাবায়। একটা শুকনো আমপাতায় পড়ে নিভে গেল বিড়িটা। আমপাতার সরু সরু শিরা জলে ছাই হতে হতে শির শির করে ধোঁওয়া ছাড়ল। শ্রীধর আগুন নেভানোর জন্য মুখভর্ত্তি আঠালো থুথু ছুঁড়ল আমপাতার ওপর। চাএর ল্যালানি ভর্ত্তি থুথ্ না পড়ল আমপাতায়—না পড়ল বিড়িতে।

হাটবসন্তপুর গ্রাম কিছুটা দূরে। মাঝে দুপাশে অন্ধকারের ছাউনি ঘেরা মেঠো রাস্তা। এ সময় রাস্তার চেহারা ছায়াপথের মতো ফ্যাকাসে সাদা। অন্ধকারে চোখ রাখলে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। ধুলো ভাঙা হাঁটা রাস্তার সংগী একমাত্র জোনাকী। চিড়িক্ চিড়িক্ জলে বনতুলসীর গোড়ায় হঠাৎ হঠাৎ স—র স—র শব্দ। শ্রীধর শব্দ করল মুখে। জোরে হাততালি দিল। ঠিক তখনি লম্বা বেল গাছ থেকে একটা পাকা বেল পড়ল বনের মধ্যে। শব্দ হল ঝুপ। শ্রীধর তাড়াতাড়ি বুকের ওপর হাত রাখে। এক সংগে জামার নীচে টাকা আর

পাজরার নীচে ভয়—দুটোকে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলার চেষ্টা করল শ্রীধর। পাঁচ আঙুলের মধ্যে টাকার শক্ত অনুভূতি সে টের পেল। ভয়টা তলিয়ে গেল নীচে। কিংবা ঘেঁটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। সে ঠিক বুঝতে পারল না এই চাপ তার বুকের কতোটা আগলাচ্ছে। অথচ শ্রীধর দেখেছে রাতে বাসবী দুহাতে কি দারুণ জোরে বুকের অসহ্য যন্ত্রণা আগলায়। মুখে কোন শব্দ করে না। মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ করে যন্ত্রণার দিক বদলে নেয়। ডানদিক থেকে বাঁদিকে ঘুরতেই শ্রীধর দেখেছে হারিকেনের আলোয় গলার দুপাশে দুটো কালো শিরা লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। চোয়ালের হাড় কাঁপে। চোখের মণিদুটো মনে হয় পাথর দুটো—আলাদা করে লাগানো। সে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে বাসবী শ্রীধরের দুহাত বুকের ওপর চেপে ধরে। কিন্তু কাকে সে থামায়—কোথায় যে ব্যথা কিছুই সে বুঝতে পারে না। বাসবী চোখের পাতা থির থির করে কাঁপাতে কাঁপাতে ঢেকুড় তোলে 'আঃ'—এই শব্দটাই বোধহয় বাসবীর বুকে কোথাও আটকে থাকে। বেরোতে চায় না। পাঁজরার ফাঁকে কিংবা বুকের অন্য ফাঁক ফোঁকরে আটকে ব্যথা বাড়ায়। পাগল করে বাসবীকে। সে উনুনে জাল দিতে দিতে হঠাৎ কাতরায়। জলখাবার দিতে গিয়ে আলের ওপর দিশেহারা হয়ে হুমড়ি খায়। রাতে দুহাতে বুকের কিংবা পিঠের ওপর চাপড় মেরে আকুলি-বিকুলি করে ওই 'আঃ' শব্দটার জন্য। শ্রীধর এই সব ভাবতে ভাবতে গাঁয়ে ঢুকল। তার বাড়ির সামনে দিয়ে একটা বাচ্ছা ছেলে ঢাকা লম্ফ নিয়ে গুগলি কিংবা ল্যাঠামাছ ধরতে যাচ্ছে। এক হাতে ছোট্ট ঝোলানো থালুই।

আবহাওয়া পাল্টে গেছে হাট বসন্তপুরের। আগে তুলসী মণ্ডপে শাঁখের শব্দে সন্ধ্যে হতো। আবছা অন্ধকারে পুকুরেরা নিশ্চিন্তমনে হুঁকোয় মুখ ডুবিয়ে সুখ টান দিতো গুড়ুক-গুড়ুক। এই শব্দ মানে হাটবসন্তপুরের মাঠে খাটা মানুষের সুখ। কারো বুকে ব্যথা হলে মোড়ল বলে দিতো কাসুন্দির রসের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে দুবেলা চেটে চেটে খেতে। কারো কোমরে ফিক্ ব্যথা চাগালে যে কেউ বলে দিতে পারত ভর সন্ধ্যে বেলা জলপোড়া নিলে সারতে লাগবে মাত্র দুদিন। কারো বউ বিয়োবে—কোন পাতার রস খেলে পোয়াতির ট্যাঁফু পাড়াপোড়শী ঘুনাক্ষরেও জানতে পারবে না। সে সব গেল কোথা? শ্রীধর শুনেছে জ্বর নিয়ে কথা হচ্ছিল। সিদু বাউরির ছেলে বলছিল 'ক্লোলোকুইন' খেলে জ্বর সেরে যাবে। সে নাকি রেডিওতে রাতদিন এই সব ওষুধ-পালার

খবর শোনে। আরো কত অসুখের অদ্ভুত অদ্ভুত ওষুধের নাম সে গড়গড় করে মুখস্থ বলছিল। দুদিন পরে তবে কি শরীর খারাপ হলে রেডিওই বলে দেবে? কি খেলে সারবে—শ্রীধর ভাবে। সে ভীষণ কুঁকড়ে যায় কেননা এক বুকের ছবি তুলতেই তার সখের মুরগীর পাল বেচতে হয়েছে সস্তা দরে।

ছেলেরা যেখানে সন্ধ্যেটা কাটায় তার নাম 'মাচা'। অন্ধকারে মাচার উপর মাঝে মাঝে জোনাকীর আলো। মাচার চারপাশ বিড়ির ধোঁওয়া কুয়াশার মতো ছড়ানো। কোলের ওপর রেডিও—দুপায়ের ফাঁক থেকে কে যেন গান গেয়ে উঠল। গানের সংগে সংগে শিস্ দিল ভীড়ের মধ্যে কেউ। মচমচ্ করে উঠল মাচার ব্যাকারী। শ্রীধর মুখ নিচু করে এই জায়গাটা পার হতে পারলেই বাড়ি। তাই চুপচাপ সে মোড়টা পার হতে হতে পিছন থেকে শুনল 'হাতে কিগো কাকা?'

—'ছবি'।

—কিসের ছবি গো?

—বুকের ছবি।

কার?

বৌটার—বড় ভুগছে। হঠাৎ রেডিওটা চুপ।

রাতে বাসবীর যন্ত্রণা শিরা উপশিরা ছিঁড়ল। কোলবালিশটা দু উরুতে চেপে বিছানায় সে হুমড়ি খেয়ে শুয়েছিল। থাকতে পারল না। হঠাৎ উঠে গিয়ে ছোট্ট জালার মতো টকটকে লাল কুমড়োটা বিছানায় বসিয়ে তার ওপর পেট চেপে ধরল, নিশ্বাস ছেড়ে। পা দুটো পিছনে সাঁতার কাটার ভংগী করে ছুঁড়তে লাগল অন্ধকারে। হারিকেনের চাপা হলুদ আলোয় বাসবীর চোখদুটো ঠেলে ঝুলে পড়ল বালিশের ওপর। সে গলার দুটো শিরায় অসম্ভব জোর দিয়ে শব্দ করল উঃ—আঃ। শ্রীধর কি করবে বুঝতে না পেরে দুহাতে জড়িয়ে ধরল বাসবীকে।—'কোথায় কষ্ট?' কোন উত্তর নেই বাসবীর। তার কোষে কোষে তখন যন্ত্রণা ছড়িয়ে যাচ্ছে তির তির করে। সে একবার তাকাল শ্রীধরের দিকে। দুটো টলটলে কুনীর উপর মণিদুটো ভাসছে। একটু নড়লেই গড়িয়ে পড়বে মাটিতে।

শ্রীধর ভাবল দীনুকে ডাকে। কিংবা রজনীকে। যদি কোন তুকতাক্ ওরা জানে! কখনো কখনো তুকতাকে যন্ত্রণা কমে যায়। কিংবা কিছু খাওয়ালে যদি আরাম পায় কিছুটা। এই সব ভাবতে ভাবতে শ্রীধর দরজার দিকে দুপা এগোতেই বাসবী যন্ত্রণার দমকের মুখে কোঁত পেড়ে বলল 'কোথায় যাচ্ছ?'

দাদু কিংবা রজনীকে ডাকি ?

বাসবী বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরল 'না—কাউকে ডাকতে হবে না।'

কেন ?

রাতে আর সাতকান করার দরকার নেই। ব্যথা চেগেছে—সেরে যাবে।

ঠিক তখনি শ্রীধর-এর মনে পড়ল টিনের তোরঙ্গের ওপর বাসবীর বুকের ছবি। সেটাকে হাতে নিয়ে বলল 'কাল সকালে চিত্ত ডাক্তারকে দেখিয়ে আসব—আসার পথে দাদু বাবুকেও বালিয়ে আসবখন্। শুধু এই রাতটুকু।'

মুখ নীচু করে বাসবী বিড়বিড় করে বলল 'ও আর দেখানোর কি আছে ? আমার বুক আমি জানি না !'

শ্রীধর ঠিক বুঝতে পারল না বাসবী তার বুকের কতটা জানে আর কতটা জানে না।

হাটবসন্তপুরের সোজা উত্তর উজিয়ে বলরামপুর। কাক-ভোরে বেরোলে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যেতো। তা হল না। যন্ত্রণা বুকে চেপে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল বাসবী। তাই ঘুম ভাঙাতে মন চাইনি শ্রীধরের। ভোরে উঠে, গোয়ালকেড়ে দুয়ার কাঁট দিয়ে, দুচাঙারী জাব কুঁচিয়ে, রোদে পোড়া দু-চারটে লাউ ডাটা কেটে চান করতে করতেই নটা। বাসবী তখন ফোলা ফোলা চোখে দাওয়ায় বসে। শ্রীধর হলুদ থাম হাতে করে বেড়িয়ে গেল। বাসবী চেয়ে রইল কেবল। তার চোখের সামনে শ্রীধর আস্তে আস্তে উত্তর জাঙালের পাড়ে মিলিয়ে গেল।

টানা তিন মাইল রাস্তা হেঁটে শ্রীধর চিত্ত ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে পৌছল। ঠিক এগারোটা। একটা মাত্র রুগীকে প্রেস্‌কিপশান্ লিখে শ্রীধরের হাতের থেকে ছবিটার ওপর চোখ রেখে বলল 'কেমন আছে ?'

কাল রাতে খুব কষ্ট হয়েছে বাবু।

চিত্ত ডাক্তারের মুখের ওপর শ্রীধর এক দৃষ্টতে তাকিয়ে। কোন কথা নেই। পাখে কম্পাউণ্ডার। ডাক্তার রিপোর্টের কাগজটা হাতের ওপর তুলে খুব আস্তে বলল 'আর কি করার আছে ?'

শ্রীধর হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল 'কোথায় কষ্ট বাবু ?'

লান্‌সে—

নান্‌সে ? আচ্ছা নান্‌সটা তো পেটে থাকে ?

কেন বলত ?

কাল রাতে বারবার পেট চেপে ধরছিল। আমার মনে হয় কষ্টটা পেটের।

মনে হয় ? তাহলে হবে—চিত্ত ডাক্তার দুটো ইনজেকসান লিখে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে একটা বড় শ্বাস নিল। বলল, দিয়ে দেখো—

বিশ্বাসে চিড় ধরল শ্রীধরের। বাসবীর যন্ত্রণায় কাটা ছাগলের মতো তোল-পাড় করা বিছানার কথা মনে পড়ল একবার। 'দিয়ে দেখো' কথাটা শ্রীধর ঠিক হজম করতে পারল না। বার বার মনে হল যে অজানা ভয়টাকে সে বুকে করে এতটা পথ এলো তার কোন সঠিক উত্তর ঐ দুটো কথার মধ্যে আছে ? দিশে-হারা অবস্থায় রাস্তা হাঁটছে সে। পাশ দিয়ে নতুন বাজারের হাকিম রেঞ্জা নতুন বুলেট চালিয়ে বাজার ফালাফালা করে চলে গেলো। তার কাণে কোন শব্দ ঢুকলো না। সোনারূপো দোকানের অ্যাসিডে গলা সোনার হলুদ রং নাকের ওপর উড়ে এলো। কোন গন্ধ পেল না শ্রীধর। দুহাত পিছনে একটা লরী হঠাৎ ব্রেক করে পাঞ্জাবী ড্রাইভার টানা একটা অচেনা ভাষায় গালাগালি দিল—কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে শুধু বলল সে, এতদাম। আশু ডাক্তারের কাছে তখনো অনেক রুগী। শ্রীধর খুব কাছে গিয়ে ঠক করে একটা প্রণাম করে অসহায় গলায় বলল। খুব বিপদ বাবু।

কেন ?

শ্রীধরের মুখ থেকে গম্ভীর মুখে সব কিছু শুনে হাতুড়ে আশুডাক্তার প্রায় একটা জোরালো চড় বসাল শ্রীধরকে 'যা—টাকা হয়েছে—ছেলে-ছোকরা ডাক্তারের কাছে যা—একটা ইনজেকসান কিনতেই ভিটে বিকোবে তো দুটো।'

আপনি যদি কিছু—ধমকানির মাঝপথে শ্রীধর বলে বসল।

'গেঞ্জি তোল—দেখা তোর বউএর কোথায় কোথায় ব্যথা হয়।'

শ্রীধর নাভির ডানদিকে দুচারবার হাত দিয়ে দেখাতে দেখাতে বলল, বুক থেকে এই দিকে নেমে আসে।

আশুডাক্তার শ্রীধরের ডানদিকের তলপেটে চাপ দিয়ে বলে এমনি করে চেপে ধরলে হাতে কিছু ঠেকেছে।

কত কি যে ঠেকে-ঠিক বুঝতে পারিনি।

হাতুড়ে আশুডাক্তার পাঁচ টাকা পকেটে পুরে খুব গম্ভীরভাবে বলল 'রাজ রোগ—ফোঁড়াফুড়িতে সারবে না। যা দিচ্ছি—খাওয়া। কমবে।

কোথায় কষ্ট বাবু ? শ্রীধর নিজেকে সামলাতে পারল না।

লিভারে পচ ধরেছে—'দু মিনিট ভুরুর মধ্যে চিন্তা ঘুরিয়ে বলল আশুডাক্তার।

পচ্—আঁতকে উঠল শ্রীধর।

হাতুড়ে আশুডাক্তার শ্রীধরের মুখের মানচিত্র দেখার লোভ সামলাতে পারল না। বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

লিভারটা কোথায়? পচলাইবা কেন? কোন ওষুধে বাসবী আরাম পাবে? পচা লিভারের ঘোলে মাংসের পোঁচ ধরবে! লিভারের পচা অংশটা শরীরের কি কি ক্ষতি করতে পারে! শ্রীধরের মাথায় এইসব কিলবিল করে ভেসে উঠল। সে চড়া রোদ মাথায় করে ধরল আলপথ।

শুকনো মাটি চিরে ফালা ফালা হয়ে গেছে। একটা ক্ষতবিক্ষত বুক এক ফোঁটা জলের অভাবে যন্ত্রণায় পোড়া। চড়া রোদ চুঁইয়ে ঢুকছে মাঠজোড়া কালো কালো ফাটলে। এমনই খরা।

ঝাঁঝাঁ রোদে শ্রীধর হাঁটে। তেতে আগুন কোন লোহার ওপর পা ফেলেছে সে। হাতে বাসবীর বুকের ছবি। একহাতে লানস্ অন্যহাতে পচা লিভারের ঘোলে মাংস হওয়ার ওষুধ। এইটুকুই সে বোঝে। বাকিটা ডাক্তারের ও বাসবীর ওপর ছেড়ে দিয়েছে সে। এই রোদে ঝাঁঝাঁ শব্দে আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। কেবল গলার মধ্যে শুকনো তেষ্টার টান। গরম নিশ্বাসে বুকের খাঁচাটা তেতে আগুনের গোলার মতো গনগনে হয়ে উঠেছে পাঁজরার নীচে। এক ঝলক থুথু টেনে শ্রীধর মাঠের ওপর ছুঁড়ে দিল। মুহূর্তে তেষ্টায় ফেটে যাওয়া মাটি জলটুকু শুষে নিল। পরে রইল কয়েকটা ফ্যাকাসে বুদবুদ। মুখের লালায় ভেজা বাকি থুতুটুকু সে জোর করে নামিয়ে দিল বুকে। একটা ঠাণ্ডা রেখা আস্তে আস্তে নেমে গেল বুকের গোপন রাস্তা দিয়ে।

টানা তিনমাস আকাশের দিকে চাতকের মতো তাকিয়ে আছে বারো বছরের দুধে ছেলে থেকে ষাট বছরের বুড়ো। সবাই ঐ থামখেয়ালী আকাশটার দিকে তাকিয়েই বড় হচ্ছে বছরের পর বছর। ডি.ভি.সি-র ক্যানেলটা মাঠের মাঝখান দিয়ে গেলে কি হবে, বর্ষায় বান ডাকে। গরমের দিনে ক্যানেলের মধ্যে মাঝরাতে ডাকাতরা জুত করে লুটের মাল ভাগ করে। ফূর্তি করে চোলাই মদের বোতল ফেলে যায়। অথচ ডি.ভি.সি সারা বছর জল দেবে কথা ছিল। সেই ক্যানেল এখন মরা শুকনো সাপের মতো পুব থেকে পশ্চিমে। তার পারে বিকেল নামলে বাচ্চা ছেলে একপাল ছাগল ছেড়ে দেয়। সরু কাস্তে দিয়ে পারের মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে থাকা গেঁড়ি-গুগ্‌লি কুড়োয়। এভাবে কিছুদিন চললে শামুক গুগ্‌লি মাটির নীচেই শুকিয়ে হাল্কা পোলা হবে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে বাকি রাস্তাটা যাবে এই ভেবে শ্রীধর তারই ভাগে করা জমিটার কোনে খেঁজুর গাছের এক-ফালি ছায়ায় বসল। গত বছর এই জমিতে এখন এক হাঁটু ধান গাছ। গোড়ায় গোড়ালী ডোবা জল। মাঝে মাঝে সোল, ল্যাঠা, চিড়ে কৈ মাছের ঘাই। ধান ফড়িং ধানের শিষে শিষে জড়াজড়ি করে দুলছে। সবুজ পাতায় ঘসাঘসির শব্দ ঘস—স্। তারই মাঝ দিয়ে গাছের নাভি ফুঁড়ে ফুলে উঠেছে ধানের কুঁড়ি। কোনটাতে বা টবটবে দুধ মুখে পুষ্ট ধানের শিষ। এক হাঁটু কাদা নিয়ে শ্রীধর ঘুরে বেড়াচ্ছে আলে আলে। কোথাও ঘোগ্ থাকলে দু কোদালে মেরে দিচ্ছে সেই লুকোন ক্ষতি চিহ্ন। আর এখন রক্তশূন্য রোগীর মতো ফ্যাকাসে পিঠ পেতে রোদ পোয়াচ্ছে মাঠ। বেশি এ্যামোনিয়া দিয়ে দিয়ে দ্বিগুণ ফসল ফলাবার লোভ হাজাধরা হাতের চেটোর মতো শুকোচ্ছে খরায়। একটা চাষ দিয়ে মাটিটা এক ওলট করেছিল শ্রীধর। এখন মনে হচ্ছে লাঙলের ফালে সে রাগে খুব জোরে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে ওর ভাত-জোগানো জমিটাকে। আলের ওপর শুকিয়ে মচমচে ঘাস। আর কেউ ঘোগের জন্য গালমন্দ করে না। অন্ধকারে ঘোগ্ মারারও তাড়া নেই। লোকের অনেক কাজ কমেছে কিন্তু পেটের গর্তে চুঁই চুঁই।

দূরে কয়েকটা ছেলে সিলভারের বাটি হাতে ফিরছে। পঞ্চায়েত থেকে খিচুড়ি কিংবা মাইলো নিয়ে। ললিত ঝিলের ওপর ওদের সারবন্দি ছায়া। শ্রীধর তাকাল সে দিকে। তার চোখের ওপর ভেসে উঠল একটা মরা গরু। ছিঁড়ে খাচ্ছে কটা শকুন। বিশাল ফুলে ওঠা পেটের ভিতর মুখ ডুবিয়ে শকুনরা টেনে টেনে তুলে আনছে নাড়িভুঁড়ি। পাঁজরার দুপাশে চাপ রক্তের দাগ। চেটে তুলে নিচ্ছে দু চারটে কুকুর।

শ্রীধর একবার ভাবল গরুর পেটেও নিশ্চয় নান্স্ আর লিভার আছে। নিশ্চয় বের করবে শকুনগুলো। কি রকম দেখতে লিভার? কোথায় লুকিয়ে থাকে লিভার? খুব দেখতে ইচ্ছে হল তার। ওই বিশাল দেহের মধ্যে নিশ্চয় লিভার আর নান্স্ বেশ খানিকটা জায়গা জোড়া করে থাকে। নইলে এত যন্ত্রণা! ঝিলের পাড়ে শিমুলগাছের ডালে ডালে কালো শকুনের দল। অনেক উপরে ঘুরে ঘুরে কাটাকুটি খেলছে আরো অনেক শকুন। গরুটা চোখ উল্টে পড়ে আছে। তার ওপর জোড়া জোড়া শকুনের চোখ। শ্রীধর একটু কাছে আসতেই হলুদ থাম আর শ্রীধরকে দেখে কয়েকটা শকুন উড়ে গিয়ে বসল গাছের ডালে। আর ঠিক তখনি শ্রীধরের মনে পড়ল—আরেঃ কোনটা লিভার—

কোনটা নান্‌স্—কেমন দেখতে—কে চিনিয়ে দেবে তাকে ? শকুন !

উত্তর জাঙালের পারে উঠেই শ্রীধর নীচের দিকে তাকাল। লুবিন কিছুটা বালির ওপর কোদাল চালাচ্ছে। বালির নীচ থেকে যদি কিছুটা জল পাওয়া যায় তো দূর থেকে টানতে হবে না। শ্রীধর চুপচাপ চলে যাচ্ছিল। হলুদ খাম হাতে শ্রীধরকে দেখেই লুবিন বলল 'হাতে কি গো ?'

—ছবি

—কিসের ?

—দেখ

ই—কি ? কিসের ছবি ?

নান্‌স্ কিংবা লিভারের হবে।

কোথায় থাকে ও গুলোন্ ?

পেটে কিংবা বুকে কোথাও হবে।

তোমার ?

বৌএর।

ডাক্তার কি বলল ?

অষুধ দিয়েছে।

সারবে ?

কমবে বলেছে।

হাঁ—কমলেই ও'গুলান নিরিয়ে দাও। যত সব আগাছা—লুবিন বিরক্ত মুখে তাকায়।

আগাছা ?

আর কি ? যত তাড়াতাড়ি পার—বলেই লুবিন আবার কাঁধের ওপরে কোদাল তুলে ধরে।

আগাছার ভবিষ্যত শ্রীধর ছেলেবেলা থেকে দেখেছে। গাছের গোড়ায় একটু গজিয়ে উঠলে কুরপুন দিয়ে চেঁচে একেবারে আলের বাইরে। আগাছাকে সে কোনদিন বড় হতে দেয় নি। জলের ভিতরে আগাছাকে পচতে দেয় নি। তার অনেক আগেই আগাছা শুকিয়ে মাটি। তবু আগাছা কথাটার মধ্যে একটা সর্বনাশ লুকিয়ে আছে। ক্ষতি হয় কিনা শ্রীধর জানে না কিন্তু ক্ষতি হতে পারে বলেই আগাছা নির্মূল করেছে সে।

অথচ লিভারটার পচ ধরে গেল ? শ্রীধর জানতেই পারল না।

ভাবতে ভাবতে শ্রীধর টের পেল আগাছার সংগে লিভারের কোথায় যেন তফাত আছে। কিছুতেই সমান করতে পারছে না সে। তবে কি বাসবীকে যন্ত্রণায় কাতরাতে দেখেনি বলে লুবিনের কাছে আগাছাও যা লিভারও তাই !

চিনচিনে ব্যথা বাড়ল একসময়। শ্রীধর বাড়িতে এসেই অষুধ খাইয়ে হাটে গিয়েছিল। ফিরে দাওয়ায় বসতেই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে বাসবী বলল 'ভাত চাপা আছে।' মুরগীগুলোকে দু'চারটে দিও।

'মুরগী নেই—সব বেচে দিয়েছি।'

বাসবী ককিয়ে উঠল 'কেন ?'

'তোর ওষুধ কিনতে হবে না ! নিভারটা—

কি বললে—নিভার ? কি বলেছে ডাক্তার ?

না—তেমন কিছু না। একটু পচ ধরেচে।

একটু নয়—অনেকখানি পচ ধরেছে।

কি করে বুঝলি ?

'আমার বুক পেট আমি বুঝি না ?' বাসবী পাশ ফিরল।

নিজের বুক-পেট নিজেকেই তো চিনতে হয়—বলেই চুপ করল শ্রীধর। কথা বাড়াল না।

হাটবসন্তপুরের রাতের ঘড়ি মুরগীর গলায় বাঁধা থাকে। রাত তিনটে কি সাড়ে তিনটে। বাসবী উল্টো ডোঙার মতো হঠাৎ বেঁকিয়ে ধরল গোটা শরীর। মুখ দিয়ে কিছুটা শব্দ বেরোল, গিলে নিল বাকিটা। বালিশের উপর মুখ ডুবিয়ে যন্ত্রণা হজম করতে করতে ভাবল নিজের বুক-পেট যখন নিজেই জানে—যন্ত্রণার ঠিকুজী-কুষ্টি ও তার নখদর্পণে। শ্রীধর তাড়াতাড়ি উঠে বসল। বাসবীকে নিজের কোলের ওপর তুলে জিজ্ঞাসা করল 'কোথায় ব্যথা ? বল—কোথায় ব্যথা ? আমি হাত বুলিয়ে দিই।'

বাসবী কোন উত্তর দিল না।

রজনীকে একবার ডাকব ?

কোন উত্তর দিল না বাসবী।

শ্রীধর ঠিক কি করবে বুঝতে না পেরে বিড়বিড় করে বলল 'পচ ধরেছে তো—যন্ত্রণা একটু হবেই।'

বাসবীর বুকের ভেতর থেকে উত্তর এল 'হুঁ', ঠিক তার পরেই শ্রীধরের

হাতের ওপর গরম নিশ্বাস পড়ল দুবার। বুকটা হাপড়ের মতো ঘনঘন ফুলে উঠল। ঘরের সমস্ত অন্ধকার যেন বাসবীর প্রশ্বাসের সংগে দেহের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। দেওয়ালে টিকটিকি শব্দ করল দুবার। দূরে গ্রামের পাহারাদার শেষ হাঁক দিল—জা—গো। যন্ত্রণায় বাসবী দুহাতে আস্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরল শ্রীধরকে। এক সময় শব্দ করল 'আঃ-আ'। পাঁজরার গোপন খুপরী থেকে এই শব্দটা পিছলে বেরিয়ে যেতে বাসবী আরামে কিংবা অজ্ঞান অবস্থায় শ্রীধরের কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল। ঠিক বোঝা গেল না।

বাইরে আবছা জ্যোৎস্না। শ্রীধর কাউকে ডাকল না। পছন্দ করে না বাসবী। দাওয়ার পর মাঠের আলে দাঁড়িয়ে সে দুহাতে মেলে ধরল বুকের ছবি। কোথায় নিভার! কোথায় নান্‌স্? কোথায় কষ্ট? টানটান করে মেলা ছবির ওপর দুটো চকচকে চোখ ঘুরতে লাগল। ছবির পিঠে পড়ল শেষ রাতের ছায়ার পরিধি ঘেরা জ্যোৎস্না।

শ্রীধরের চোখের ওপর ভেসে উঠল অজস্র কালো গভীর চিহ্ন। বিন্দু বিন্দু ছড়ানো। এত কষ্ট! এই বাসবী তার বুক চেনে? এত কষ্টের দাগ কারো বুকে থাকে? অবাক হয়ে ভাবল সে? পাঁজরার ফাঁকে ফাঁকে ঘন কালো স্যাওলার দাগ। জমা কাশির চিহ্ন ছোট ছোট কালো ঘুঁটের মতো লেপটে। বাঁদিকে ফ্যাকাশে সাদা একটা চাবুকের দাগ তার ফাঁকে ফাঁকে যন্ত্রণার সরু রেখা গড়িয়ে নেমেছে পেটের দিকে। অজস্র ডালপালা জড়াজড়ি করে মাকড়সার জাল বিছিয়ে যন্ত্রণার বাসা বেঁধেছে সারা বুকের ঘুপড়িতে। কোথায় লুকিয়ে থাকে ঐ আঃ শব্দটা! কোন রাস্তায় সে বেড়িয়ে আসে? সার্চ লাইটের মতো তার চোখ দুটো সারা ছবির অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ায়! ঠিক কি যেন তার জানা হল না—বাকি থেকে গেল ভেবে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বুকের ছবির দিকে।

আস্তে আস্তে বাসবীর বুকের ছবির ওপর উঠে আসে গোটা হাট বসন্তপুর। পাঁজরার হাড়গুলো ডাইনে বাঁয়ে সার সার আলে ভাগ করে দিয়েছে উত্তর দক্ষিণের মাঠ। তাদেরই ফাঁকে ফাঁকে শুকনো ছোট ছোট মাঠ সেটেলমেন্টের সময় ভাগ করেছে সরকারী লোক। ডানদিকের বড় কালো চিহ্নটা ললিত লালের ঝিল। তার পাশে একটু দূরে উত্তর জ্যাঙালের পাড়। সোজা নেমে গেছে নীচের অনেকটা পেটের মধ্যে। বাঁদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মরা ডোবা—সানপুকুর—কুণ্ডেপুকুর—তালপুকুরের কালো কালো চিহ্ন। একটা সোজা রেখা

বাঁ দিক দিয়ে চলে গেছে কোনাকুনি—তার দুপাশে একবার চাষ দেওয়া আঁচড়ানো মাঠ। এখানে সেখানে জড়ো করা আগাছার হাল্কা দাগ। মাঠে মাঠে শুধু যন্ত্রণার চিহ্ন। চিরে ফালা ফালা। আর গোটা ছবির মাঝ বরাবর একটা রাস্তা উপর থেকে নীচে নেমে এসেছে—ডি.ভি.সি-র ক্যানেল—ধপধপে সাদা শুকনো খট্‌খটে—কোথাও এক বিন্দু জল নেই।

প্রবন্ধ

ইংরেজি ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ প্রথম কবে ইংরেজি শেখা শুরু করেন বা তাঁকে ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা হয়, তা নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। বিষয়টি কৌতূহলের, কারণ বিষয়টি ইংরেজি না, বিষয় রবীন্দ্রনাথ। গবেষণা করার দরকার হত না, যদি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বিপত্তির কারণ না হতেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর লেখা পড়লে কিছু বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

১৯৩৬ ফেব্রুয়ারিতে একটি ভাষণে, 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে, দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা পরম্পর দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা! যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভার্সিটির প্রবেশ দ্বারের দিকে জুস্তিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে', যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I, by myself I', তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্ররা যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তি পোড়োদের জন্য তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সম্মতি ছিল 'নর্মাল স্কুল' নামধারী মাথা হেঁট করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা—পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-

পরিমাণে সংস্কৃত প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর পর্যন্ত ইংরেজি বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।"

এখানে স্পষ্টতঃই, রবীন্দ্রনাথ যে-বিষয়ে কথা বলছেন, তা হল কোন্ ভাষা, তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত বাংলা ভাষায় শিক্ষা পেয়েছিলেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তিনি কিছু বলছেন না। ইংরেজি ভাষার শিক্ষা আরম্ভ হবার পর তিনি স্কুল যাওয়া ছেড়ে দেন, সেটা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা নিতে অনিচ্ছার জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে তা উল্লেখ না করে। তবে প্রসঙ্গটা এমনই যে, তিনি এমন ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যেন ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা পাওয়াটা তাঁর মনঃপুত হয়নি বলেই তিনি স্কুল ছেড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবন, তাঁর বিভিন্ন স্কুলের পক্ষে গৌরবের বিষয় নয় বটে, তবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও গৌরবের নয়—পরীক্ষায় ফেল করাটা এমন কিছু কৃতিত্বের বিষয় নয়।

রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবন নিয়ে কিছু রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে। শারদীয় পক্ষিরাজ ১৩৮৬-এ চিত্তরঞ্জন দেব, ১৯৮০ সালের দেশ পত্রিকার একটি সংখ্যায় প্রশান্তকুমার পাল এবং ১৯৮১ সালের দেশ পত্রিকার আর একটি সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন দেব রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আনুমানিক তথ্যের ভিত্তিতে রবীন্দ্রজীবনীর এই অংশটি নাকচ করে দেখিয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিজ হিসাবের ক্যাশ বহি' নামক কয়েকটি খাতা অবলম্বন করে, রবীন্দ্রনাথের স্কুলজীবন ছিল এইরকম :

১৮৬৫ মার্চ : কলিকাতা ট্রেনিং অ্যাকাডেমি
অক্টোবর : নর্মাল স্কুল বা সরকারী পাঠশালা
১৮৭২ মার্চ : বেঙ্গল অ্যাকাডেমি
১৮৭৪ জানুয়ারি : নর্মাল স্কুল
১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি : সেণ্ট জেভিয়ার্স

তিন বছর দশ মাস বয়সে রবীন্দ্রনাথ কান্নাকাটির জোরে যে স্কুলটিতে ভর্তি হয়েছিলেন, সেই কলিকাতা ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে কী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হত

জানা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই স্কুলটির কথা বিস্তৃত হয়ে বলেছেন, তিনি প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে। এটাতেও যে বাংলাভাষায়ই শিক্ষা দেওয়া হতো, তারও কোনো প্রমাণ নেই। দুটো স্কুলেই তখনকার দিনে বিত্তশালী পরিবারের ছেলেরা পড়তে যেত এবং দুটোর স্কুলেরই নামকরণ থেকে এমন কথা প্রমাণিত হচ্ছে না, যে পরিচালকেরা ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সাড়ে দশ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে বেঙ্গল অ্যাকাডেমিতে প্রবেশ করেন, সেটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ফিরিঙ্গি স্কুল, ডক্রুজ সাহেবের। এখানে যে শিক্ষা ইংরেজি ভাষায়ই দেওয়া হতো সেবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অতএব রবীন্দ্রনাথের 'বারো বৎসর পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত' শিক্ষার তথ্যটি একেবারেই অগ্রাহ্য, অন্ততঃ দশ বছর দশ মাস বয়সে ইংরেজিভাষায় শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল তাঁর।

ইংরেজি-বর্জিত শিক্ষার অর্থ অবশ্য ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা। কেননা, নর্মাল স্কুলের স্মৃতি-বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, বাচ্চাদের সেই স্কুলে কীভাবে 'কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং' কবিতাটি আওড়াতে হতো। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিভ্রম না হলে, তাঁর কথামতো এটা নর্মাল স্কুলের স্মৃতি, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই সময় বয়স চার থেকে এগারোর মধ্যে। 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধ অনুযায়ী এই স্কুলের শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া হলেও, ইংরেজি ভাষাটির শিক্ষা তাহলে দেওয়া হচ্ছেই।

এটা যদি সত্য হয়, তাহলে 'ছেলেবেলায়' ঊনআশি বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ সত্য নয়। সেখানে তিনি বলছেন,

'তখনো ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে মুখস্থ বুক-ধড়াস সন্ধেবেলার ঘাড়ে চেপে বসেনি। সেজদাদা বলতেন, আগে চাই বাংলাভাষার গাথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনো বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিদ্যে পৌঁছয়নি।

সেজদাদা অথবা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অভিভাবকদের এই বাংলাভাষা প্রীতি রবীন্দ্রনাথের লেখায় বারেবারে এসেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার :

১। কিন্তু তিনি (অঘোরবাবু যত ভালোমানুষই হউন, তাঁহার পড়াইবার

সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি। সমস্ত দুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিম্‌টিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালি ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবনস্মৃতি।

২। সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন। যথাসময়ে তাঁকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভর্তি করে! তার পূর্বেই তার ভাষায় প্রথম দখল হয়ে গেছে বাংলায়। ছেলেবেলা।

৩। চুঁচুড়া হইতে ৭ ফাল্গুন ১২৯০ দেবেন্দ্রনাথ লিখিলেন, "ইংরেজি শিক্ষার জন্য ছোটবৌকে লরেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে।" রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড।

৪। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে (সত্য প্রসাদ) বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাবার জো করিয়াছে।...তিনি কহিলেন, "আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই।" "খুশিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল।' বাংলা শিক্ষার অবসান, জীবনস্মৃতি।

অঘোরবাবু, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, ক্যাশবহির সাক্ষ্যে, ৫ মার্চ ১৮৬৯, এবং অন্তত দুবছর পড়িয়ে ছিলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন আট থেকে দশ। ওই ক্যাশবহির সাক্ষ্যেই জানা যাচ্ছে, অঘোরবাবুর আগে, ইংরেজি পড়ানোর শিক্ষক ছিলেন রাখাল দাস দত্ত, শ্রাবণ ১২৭৫ (আগস্ট ১৮৬৮) থেকে ফাল্গুন ১২৭৫ (মার্চ ১৮৬৯) পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ তাহলে অন্তত সাত বছর বয়সেই ইংরেজি শেখা সুরু করেন।

সেজদাদা, হেমেন্দ্রনাথ, যথাকালে তাঁর মেয়েকে লোরেটোতে ভর্তি করিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'যথাকালে' কখন নির্দিষ্ট করেন নি, তবে বলে দিয়েছেন, তার আগেই মেয়ে প্রতিভার বাংলাশেখা হয়ে গেছে। অবশ্য বাংলা ভাষায়, বাংলাভাষা শেখালেই যে বাংলা শেখা হয় না তা-ও বলেছেন বাংলাশিক্ষা অবসান প্রসঙ্গে নীলকমল ঘোষালের কথা বলার সময়। নীলকমল রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন (২৯ নভেম্বর ১৮৬৬) ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৩ থেকে মাঘ ১২৭৮ পর্যন্ত।

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ he is up তিনি হন উপরে পাঠের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন নর্মাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পাওয়ায়। অথচ ১৯১৬ সালে ছাত্রশাসনতন্ত্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন।

"মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন I শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে : Myself I, by Myself। ইংরেজি এই I শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছে, ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল।"

ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া ব্যাপারে ঠাকুরবাড়িতে যে কোনো সংস্কার ছিল না, তার প্রমাণ মেলে প্রতিভাকে লোরেটোতে ভর্তি করার ব্যাপারে। দেবেন্দ্রনাথ যখন মৃণালিনীকে লোরেটোতে ভর্তি করতে বলছেন, তখন মৃণালিনীর বয়স ১০।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও শান্তিনিকেতনে ইংরেজি শিক্ষা দিতেন ছাত্রদের অল্প বয়সে। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থে প্রমথনাথ বিশী লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সবিকে বলছেন 'সবির একটি গাধা আছে' ইংরেজিতে বলতে এবং সবি অম্লান বদনে উত্তর দিচ্ছে 'Sabi is an ass'। এ সময়ে সবির বেশি বয়স হওয়ার কথা নয়। শুধু ইংরেজি শিক্ষাই নয়, ইংরেজি ভাষাতেই নয় দশ বৎসরের শিশুদের ইংরেজি পড়ানোর চেষ্টার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর ছাত্রশাসনতন্ত্র প্রবন্ধতেই।

"এই জন্যই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেক দিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম।···সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। ক্লাসে না-যাওয়ার কারণ ইংরেজিতে শিক্ষার জন্য নয়। শিক্ষকটির দুর্ব্যবহার।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়ায়, এবং ইংরেজি ভাষাতেই, রবীন্দ্রনাথ যে একেবারেই সংকুচিত ছিলেন না, তার প্রমাণ ১৮৯৮ তে শিলাইদহে নিজের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি পড়ানোর জন্য তাঁর লরেন্সকে নিযুক্ত করায়। তাঁর পুত্র কন্যাদের তখন বয়স, মাধুরীলতার ১২, রথীন্দ্রনাথের ১০, রেণুকার ৮, মীরার ৬ এবং শমীন্দ্রের ৪। এর পর নিবেদিতাকে অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ছেলেমেয়েদের ইংরেজি পড়ানোর জন্য এবং নিবেদিতার কাছে তিরস্কৃত হয়ে ছিলেন, সেকথা তিনি ভগিনী নিবেদিতা প্রবন্ধে কবুল করেছেন।

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলাশিক্ষা যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে তখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিলাম।' বহুদূর কতদূর? একটু আগেই তিনি বলেছেন, 'সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু

আসিতেন।' অঘোরবাবু যখন আসিতেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স আট থেকে দশ। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধে বলছেন,

"তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথা সময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না, ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানো অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি। তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।···নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়।"

প্রশ্নটা এই নয় যে শিশুবয়সে বাঙালির ইংরেজি শেখা উচিত কিনা বা ইংরেজি ভাষায় ইংরেজি শেখা উচিত কি না। প্রশ্নটা এই, রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন তিনি মাতৃভাষা ভালো করে শেখার পর ইংরেজি শিখেছিলেন বলেই ইংরেজি ভালো শিখেছিলেন, সেটা তার জীবন থেকে পরীক্ষিত সত্য বলে গণ্য করা যাচ্ছে কি? তিনি সাত বৎসর বয়স থেকেই ইংরেজি শেখা শুরু করেছিলেন। আর করোলি শিশুদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া যে গর্হিত অপরাধ তার কোন পরিচয় দেননি নিজের জীবনেও; পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনে শিশুদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন ইংরেজি পাঠ ১ম ভাগ; ইংরেজি সহজশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ; ইংরেজি সোপান, ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা : ১ম ও ২য় ভাগ।

জীবনস্মৃতি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ওঁর বাল্যজীবনে ইংরেজিশিক্ষা সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী যেসব কথা বলেছেন, তা বিস্ময়কর। একবার তিনি বলছেন,

"প্যারি সরকারের প্রথম দ্বিতীয় ইংরেজি পাঠ কোনোমতে শেষ করিতেই আমাদিগকে মকলকস্ কোর্স অফ রীডিং শ্রেণীর একখানা পুস্তক ধরানো হইল। একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত এবং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বই যাহার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই দয়ামায়া কিছুই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মতো ছেলেদের বইয়ে তখন পাতায় পাতায় ছবির চলন ছিল না। প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের

দেউড়িতেই থাকে-থাকে সারবাঁধা সিলেবল্-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাকসেন্ট চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপালবধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণ দুর্গে মাথা ঠুকিয়া কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।"

এর কিছুক্ষণ পরই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

"যখন চারিদিকে খুব করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।"

ছেলেবেলাতেও রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক'। মাস্টারমশায় কথাটি রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন অঘোরবাবু প্রসঙ্গে। এবং এই পড়াশোনার শোচনীয় বর্ণনা জীবনস্মৃতি এবং ছেলেবেলায় অনুরূপ বলে, মনে করার কারণ আছে এই মাস্টারমশায় অঘোরবাবুই হওয়া সম্ভব। তাহালে রবীন্দ্রনাথ আট থেকে দশ বছর বয়সেই প্যারী সরকার পড়ছেন। ইংরেজি পড়ানোর ধুম থেকে তিনিও তাহলে রক্ষা পান নি। 'ছেলেবেলা'তে আবার লিখছেন,

'অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীডার যেন ওত পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা চলচলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি, অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে—তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর।'

এটা অবশ্যই সেই মকলকস্ অব রীডিং। এবং রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বেশি হলে দশ।

বাংলাভাষায় বাঙালিকে শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই আন্দোলন রবীন্দ্রনাথ শুরু করেন প্রকাশ্যে ১৮৯২ সালে যখন তাঁর বয়স ৩১। রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে তিনি পড়েন, শিক্ষার হেরফের। কিন্তু দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে তিনি এই হয়ত সহজ কথাটি তেমন গুছিয়ে বলতে পারেন নি, ফলে কারো কারো মনে হয়েছে, তিনি ইংরেজি ভাষাটিকেই বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে তাঁকে আবার লিখতে হলো, 'শিক্ষার হের-ফের' প্রবন্ধের অনুবৃত্তি, যাতে তিনি সমালোচকদের সম্পর্কে বলেছেন,

"লেখক আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'যাঁহার মত এক্ষণে আলোচনা হইল তিনি তো ইংরেজিশিক্ষা নিষ্ফল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত।'—যদি সত্যিই আমি

এইমাত্র বলিতাম তবে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইতাম বলা শক্ত, তবে এখনকার ছেলেরা আমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত এবং বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু ও আনন্দমোহন বসু মহাশয় কখনোই আমার লেখার তিলমাত্র অনুমোদন করিতেন না।' মনে রাখা দরকার ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে উক্ত তিন মনীষী সন্দেহ প্রকাশ করেন নি।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় বাঙালিকে, এ কথা রবীন্দ্রনাথ কখনোই বলেন নি। যা তিনি বলেছেন তা হলো অবৈজ্ঞানিক, অমনোজ্ঞ ভাবে বাঙালি শিশুদের ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা দুঃসহ এবং হাস্যকর। তাঁর অঘোর মাস্টারমশাই-ভীতি, তাঁর প্যারী সরকার—মকলকস্ বিতৃষ্ণা, তাঁর he is up তিনি হন উপরে, I মানে myself ইত্যাদি ব্যঙ্গ, এসবই ইংরেজি শেখানোর প্রণালীর বিরুদ্ধে, ইংরেজি শেখার বিরুদ্ধে নয়।

এই কথাই তিনি একেবারে গোড়ার দিকে শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধে বলেছিলেন,

"এক তো, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো-একটা শিশুপাঠ্য রীডারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে।' ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত। এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক। অথবা Snow-fall খেলায় চার্লি এবং কেটির মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলো পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্ফূর্তির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

"আবার নিচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এনট্রেন্স্ পাস, কেহ-বা এনট্রেন্স্ ফেল; ইংরাজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা না জানে ভালো ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো

অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।"

ইংরেজি কে শেখাচ্ছেন এবং কীভাবে শেখাচ্ছেন, এটাই বড়ো কথা, উপযুক্ত শিক্ষক উপযোগী পদ্ধতিতে শেখাচ্ছেন কি না এটাই বিচার্য, ইংরাজি শিক্ষাকে বিসর্জন দিতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেন নি। অঘোরবাবু তাঁর কাছে বিভীষিকা ছিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন বারো বছরের রবীন্দ্রনাথকে হিমালয়ের পাহাড়ে Peter Parley's Tales পড়াতেন বা 'প্রকটরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ' হতে পড়াতেন তখন শিশু রবীন্দ্রনাথ চোখে অন্ধকার দেখেন নি। 'ছেলেবেলায় যখন ইংরেজি আমি প্রায় কিছুই জানিতাম না তখন প্রচুর ছবিওয়ালা Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো-আনা কথাই বুঝিতে পারি নাই—নিতান্ত আবছায়া-গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই ছবিগুলো গাঁথিয়াছিলাম—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শূন্য পাইতাম সন্দেহ নাই কিন্তু আমার পক্ষে সে-পড়া ততবড়ো শূন্য হয় নাই।' (জীবনস্মৃতি)।

এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ বিকৃত সাহেবিপনা সহ্য করতে পারতেন না। ১৯০৬ সালে শিক্ষাসমস্যা প্রবন্ধে তিনি লিখছেন,

'আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়—অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে: Mamma, Mamma, look, lot of Babus are Coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে!'

এ কথাও সত্য, রবীন্দ্রনাথ জানতেন দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ইংরেজি শিক্ষা সম্ভব হয় না এবং ইংরেজি-জানা এবং ইংরেজি না-জানা দুই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। শিক্ষার বিকিরণ, ১৯৩৩ সালে, প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

'এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্ট চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্যদিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ রইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। ...সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন, তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।'

এই কথাই তিনি সক্ষোভে আগেও বলেছিলেন, ১৯৩২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ প্রবন্ধে,

'আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়।'

দেশের অধিকাংশ লোক ইংরেজি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকছে, আধুনিক শিক্ষার সুযোগও পাচ্ছে না, তাদের সমস্যা তো আছেই, কিন্তু যে অংশটি ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছে, তাদেরও সমস্যা থেকে যাচ্ছে। ১৯১৫ সালে, শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে তিনি বললেন,

'বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি-বা তারা কোনোমতে এনট্রেন্সের দেউরিটা তরিয়া যায়। উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে।

'এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই; ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরাজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না।'

এদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ কী?

'প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার

কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।'

অল্প বয়সে ইংরেজি শেখানো শুরু হবে। যারা ইংরেজি শিখতে পারল না, তারা বড়ো হয়ে বাংলাতে উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যাবে—এই সমাধান রবীন্দ্রনাথ একবার বলেই থামেন নি, ১৯৩৬ সালেও শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধেও বললেন। ১৯১৫ ও ১৯৩৬ সালের এই দুই প্রবন্ধে ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা প্রসঙ্গের অংশটুকু ভাষাগতভাবে প্রায় এক। হয়তো শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ রচনা করার সময় শিক্ষার বাহন প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ আর একবার ঝালিয়ে নিয়েছিলেন, তবে, মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, অল্পবয়সে ইংরেজি শেখানো এবং বড় বয়সে যারা ইংরেজি শিখতে পারল না তাদের বাংলায় এগিয়ে যাওয়া। এই পরামর্শটি রবীন্দ্রনাথ ২১ বছর পরও দিচ্ছেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যখন সন্দেহ করেছিলেন, দেশের লোক ইংরেজি শিক্ষা বর্জন করছে, তখন তীব্র আপত্তি করেছিলেন। যেহেতু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে আধুনিক জগতের সংস্পর্শে এসেছে। এই কথা তিনি সারা জীবন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলে এসেছেন।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর পশ্চিমমুখিতার সমালোচনা করলে ক্রুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালে বাস্তব প্রবন্ধে বলেছিলেন,

'আমাদের কালের লেখকদের মোটা অপরাধটা এই যে, আমরা ইংরেজি পড়িয়াছি। ইংরেজি শিক্ষা বাঙালির পক্ষে বাস্তব নহে, অতএব তাহা বাস্তবতার কারণও নহে, আর সেইজন্যই এখনকার সাহিত্য দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা ও আনন্দ দিতে পারে না।

'উত্তম কথা। কিন্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা তো নগণ্য। কেহ তাহাদের তো কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমরা কেবল আমাদের অবাস্তবতার জোরে দেশের সমস্ত বাস্তবিকদের চেয়ে জিতিয়া যাইব, ইহা স্বভাবের নিয়ম নহে।...

'অথচ এদিকে ইংরেজি পোড়োরা যে-সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও, সে বাড়িয়া উঠিতেছে; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের লক্ষণ।...ইংরাজি শিক্ষা সোনার কাঠির মতো আমাদের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছে।'

এই কথা দীর্ঘকাল পর ১৯৩৬ সালে ছাত্রসম্ভাষণ প্রবন্ধেও বললেন,

'এই যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়।'

জীবনের শেষপ্রান্তে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্বীকার করেছিলেন যে এই অনুপ্রাণিতের সংখ্যা ভারতবর্ষে খুবই নগণ্য। মিস র‍্যাথবোনের চিঠির উত্তরে বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ বললেন,

'কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ইংরাজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্যপথ নাই, তবে সেই "ইংলণ্ডীয় চিত্তধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে" দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছে।'

এ কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন ঠিকই। তবে দোষটা ইংরেজি ভাষার নয়। বিদেশি শাসকেরা ভারতীয়দের সত্যসত্যই ইংরাজি শিক্ষা দিতে চায় নি, সুতরাং দোষটা তাদেরই। দোষটা, ভারতীয়দের ভুল নিয়মে অযোগ্য শিক্ষক দিয়ে ইংরেজি শেখানোর চেষ্টা হয়েছে, বা চেষ্টার ভান করা হয়েছে। তৎসত্ত্বেও কিছু ভারতবাসী ইংরেজি শিখেছেন এবং ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ করেছেন, এটাই রবীন্দ্রনাথের মূল কথা।

কবিতা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে

রাণা চট্টোপাধ্যায়

আমাকে এমন একজন কবির ওপর আলোচনা করতে বলা হয়েছে, তাঁকে আমি বহুদিন থেকে জানি। তপনের কবিতার সঙ্গে আমার অন্তত বারো-তেরো বছরের পরিচয়। ১৯৬৭ সাল থেকে জানি। সে-সময় ও পূর্ব পুটিয়ারীতে থাকতেন। স্নাতক শ্রেণীর কৃতি ছাত্র। কবিতার নেশা ধরেছে। অধনালুপ্ত 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। সালের হিসাবে তপন কি সত্তর দশকের কবি?

ঠিক জানিনা। তবে, ওর কবিতার আমূল পরিবর্তন কিন্তু সত্তর দশকেই চোখে পড়েছে। ইদানীং ওর কবিতা বেশ ভাল লাগছে। এতটা উজ্জ্বল আগে মনে হয়নি। কিন্তু এখন নিজস্ব ধারণা ও ক্রমশ নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে ওর এক নিজস্ব জগত তৈরী হয়ে গেছে। সেই জগত হয়তো তথাকথিত আধুনিক কোন কবিকে আকর্ষণ করবে না। তপনের কবিতায় একটা গল্প থাকে, সে গল্প কোন অচিন রহস্যময়তার দিকে যাওয়া গল্প নয়, সে গল্প আমাদের কাছাকাছি কোন লৌকিক দেবতাকে ঘিরে তৈরী হয়। লোকায়ত শব্দের ভারে ওর কবিতার চিদানন্দ রূপ প্রস্ফুটিত, যেমন—

"আমারও কি মানত ছিল, থেকে যায়, নাকি আমার কৈশোরকাল
অন্ধ হয়ে ছুটে আসে রহস্যের জটিল ধাঁধাতে, খুঁজে ছাখে
কোথায় সম্পাত আছে
চন্দন ডালের নিচে কঙ্কালের হাড়গোড়, করোটিতে···"

(মা বনবিবির হাজার বাহন)

ওর কবিতায় লৌকিক দেব-দেবীর অনেক কথা আছে। বাংলা কবিতায় এর আগে আমি মাত্র কয়েকজনকে দেখেছি ঈশ্বর নিয়ে কথা বলতে। গত সংখ্যায় 'বিভাবে'

কবি আলোক সরকার কবি সুধেন্দু মল্লিকের কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন—"আমি জানি যে অনেক মহৎ কবিতাই শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক কবিতা, যদি আধ্যাত্মিকতা বলতে গাঢ়তম আত্মোপলব্ধি বুঝি। সেইরকম কবিতা জীবনানন্দ লিখেছেন, অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন এবং এক সময় অলোকরঞ্জন এবং সম্প্রতি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত লিখছেন। অবশ্য ঈশ্বরীয় কবিতা যা এর আগেও লেখা হয়েছে, তার সঙ্গে তপনের মানসিকতা সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে শাক্ত-পদাবলীর পার্থক্য। তেমনি এঁদের সঙ্গে তপনের কবিতার প্রভেদ। তা'ছাড়া তপনের প্রতিভা এঁদের সঙ্গে সমান্তর নয়। ওর কবিতা আরো ভাঙবে। আরো গভীরত্বের দিকে যাবে। এর আগে 'বাবা দক্ষিণরায়ের গুলগুলি চোখ' বা 'মা বনবিবির হাজার বাহন' শীর্ষক কবিতাগুলিতে সে প্রমাণ পাঠক পেয়েছেন। তবে নির্বাচিত এই কবিতাগুলি ভিন্নস্বাদের। এখানে তপন অনেক বেশী রহস্যময়তার দিকে গেছেন। কঠিনরসের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে ভয়ংকর রসের দিকে যেতে হয়। তন্ত্রমতে মানব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘিরে এক-একটি তান্ত্রিক নাম তৈরী হয়েছে। যেমন, কুল-কুণ্ডলিনী মূলাধার, ইড়া ও সুষুম্না নাড়ী, নাভীমূল প্রভৃতি। তপন এইসব নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবিতায় শব্দচয়ন কারো কারো হয়তো কচিৎ পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শবযাত্রা' পর্যায়ের কবিতাগুলির কথা মনে পড়তে পারে। তবে প্রসঙ্গ আলাদা। এর আগে ওর কবিতার বিষয় নিয়ে চিত্রশিল্পে চর্চা হয়েছে। নীরোদ মজুমদার-এর ছবিতে আমরা তান্ত্রিক উপস্থিতি দেখেছি, বাংলার অনেক খ্যাতিমান শিল্পী এই ধারাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। মার্কিনি তরুণ বীট কবি সীন্‌সবার্গও কালীকে নিয়ে কবিতা লিখেছে। তবু, কবিতায় এইসব নিয়ে কেউ তেমন একাগ্র কাজ করেন নি। বহু পূর্বে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম, দেহজ কামনা-বাসনা সর্বোপরি সহবাসের যে-সব কাব্যিক বর্ণনা আছে তাকে কেউ কেউ, 'তান্ত্রিক আর্ট ফর্ম' এর প্রাথমিক রূপ বলে ভাবেন। এ নিয়ে ভাবা চলতে পারে। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়—

"কেবল শরীর ছাড়া যে কোন নারীর কাছে প্রার্থনীয় কিছুই থাকে না
প্রকৃতি এমন দেহবৎসল,
তার চোখ নেই, মুখ নেই, হাত-পা-আত্মাও নেই
তাই শব ছুঁয়ে বসে থাকি ধ্যানস্থ, উদাসীন"

(শব ছুঁয়ে বসে থাকি)

এক তন্ত্রসাধকের মূল কথা বলে। অবশ্য কবিতায় তন্ত্রবাদ কতখানি কার্যকরি তাও ভেবে দেখা দরকার। কারণ, কবিতা ক্রমশই বিষয়হীনতার দিকে চলে যাচ্ছে। কবিতা এখন অন্ধ আবেগ নির্ভর নয়, সুন্দর বাক্যবন্ধের সমাহার নয়, অক্ষর সাজানো খেলা নয়। কবিতা এখন জীবনের কথা বলে, অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যকে সহজ-সরল ভাবে উপস্থিতি করে, সেখানে তান্ত্রিক কবিতার মূল্য কতটুকু আমার জানা নেই। জানা না থাকলেও শিল্প হিসাবে উত্তীর্ণ কবিতা আমাদের মনস্ক অভিনিবেশ দাবী করবেই! তবে মনে হয়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরো সজাগ হ'তে হবে শব্দ নির্বাচনে, কথা কম বলতে হবে। শব্দ ব্যবহার কখনো কখনো কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেছে। যেমন নির্বাচিত 'পোড়াকাঠে রাখল হাত' কবিতাটি। এর কিছু লাইন হয়তো বাদ দেয়া যেতো। তবু তপন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কবিতা পড়ে আমি বুঝতে পারি ও অনেকদূর যাওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখে।

কবিতাগুচ্ছ

তন্ত্রবিষয়ক কবিতাগুচ্ছ

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

শব ছুঁয়ে বসে থাকি

মড়ার খুলিতে রাখা মদ চেখে
বুঝতে চেয়েছি আমি কতোটা তান্ত্রিক,
শ্মশানঘাটের থেকে চুরি করে এনেছি নারীর লাশ,
কুণ্ডলিনী ঘুমিয়ে রয়েছে—
নাভিরোম থেকে লোভসম্মত সাপ নেমে যায় সৃষ্টির উৎস-অভিমুখে
শীতের দাঁড়ায় তার তনুদেহে একঋতু ঘুম,
ওইখানে দেবো তা, চুমকুড়ি, তাই কৃষ্ণপক্ষের রাতে
টঙ্কার দিয়েছি এই শরীরের কেন্দ্রবিন্দুটিতে—
যতোদূর যাই, শুধু ধূ ধূ রাত, নারীর অপর নাম প্রকৃতি,
টান-বাকলের ঘোরে তার অপার শরীর জুড়ে ডালপালা
আর শিকড়ে বিভ্রম ভালোমানুষের মতো নিপাট—
আমি মূলাধার থেকে শুরু করে
চুঁড়েছি ধাঁড়ার মাঠ, জল থৈ থৈ প্রবল প্লাবনে
ভাসিয়ে খুঁজেছি নিজেকে, নিজেরই পিছুপিছু গিয়ে কতোদূর,—
জেগে ওঠে কুণ্ডলিনী,
তার বিহ্বল ফণা নেড়েচেড়ে দেখি
কেবল শরীর ছাড়া যেকোন নারীর কাছে প্রার্থনীয় কিছুই থাকে না,
প্রকৃতি এমন দেহবৎসল,
তার চোখ নেই, মুখ নেই, তাত পা, আত্মাও নেই,
তাই সব ছুঁয়ে বসে থাকি ধ্যানস্থ, উদাসীন—

পোড়া কাঠে রাখা হাত

বিছানায় টঙ্ হয়ে শুয়ে আছে অপরাজিতার ফুল,
উদ্বেল হাওয়া যায় নিঃসাড়ে ফিসফিস করে,
'ওখানে যোজনা করো চন্দনের চেতনা আমূল,
মূল থেকে মূলাধার অবাধ মন্থন হলে পর
পারিজাত, ঐরাবতের সাথে তুমিও কোঁচড়ে
পাবে অমৃতের বর—'
আমি নীল হয়ে দেখি
খড়কুটো, বেবাক্ জ্বলছে কাম, তোমার ও-মুখ
আগুনের তাতে লাল-চকচকে হয়ে যেন-বা অস্থির,
কানের লতিতে বারবার টোকা দিয়ে যায়, 'ছ্যাখো, ওই উন্মুখ
ঝড়ের প্রলয় আছে বিছানায় একা থমথমে
প্রবল পঞ্চমে,
চোখের পালক তার নাচে তিরতির ;
তবু জীবনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসেছি আমি,
পোড়াকাঠে রাখা হাত
ভিতরে কোথাও নেই টানাপোড়েন, কুচুটি, সংঘাত—
মশারীর ভিতরে সেই শবদেহ আজ উন্মার্গগামী,
তার থেকে নির্লিপ্ততা এসে চারিয়ে গিয়েছে মজ্জায়
দিন-দিন,
এক শ্মশানবৈরাগ্য এসে এই নিশিরাতে আমাকে করেছে উদাসীন—

রাতে গহন নির্জনে

তুই নাকি অন্নপূর্ণা ছিলি, আজ সেই হাতে উজিয়ে উঠেছে খাঁড়া,
শ্মশানের চারপাশে নৃমুণ্ড গড়াগড়ি যায়,
রাজ্যব্যাপী কবন্ধের এমন উৎসব
দেখে টলে ওঠে 'শিব' 'শিব' বলে নির্ভাবনাও—
উৎপন্ন শস্যের এই সংহার
কাঁপিয়ে দিচ্ছে জনজীবন, বীজমন্ত্র, ইড়া ও সুষুম্না, নাভিমূল,

আমি এই যজ্ঞে নিজেকে সমর্পণ করে যাবো
এই ভেবে আঙুলের হাড় কেটে বানিয়েছি পাশা,
আয় সর্বনাশী, আজ তোর সাথে সারারাত
মরণ মরণ খেলা হবে,
এই শরীর সুদ্ধ রাজি—

তারপর সরে যাবে সমস্ত আড়াল,
পর্দার পর পর্দা লহমায় ছিঁড়ে যেতে যেতে
দেখবো বিবশে বিশ্বরূপ,
যে তুই সংহারে মত্ত, ফের তাতে ঝলসে উঠুক সৃষ্টি,
আমিও বসেছি তন্ত্রে
আজ রাতে গহন নির্জনে তোর যোনিপূজা হবে
চন্দনে চন্দনে—

আলোচনা

রবীন্দ্রনাথের এপিটাফ

পিনাকী ভাদুড়ী

বাঙালীর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব সুরু হয় পঁচিশে বৈশাখে। তার আরেকটি করুণতম শোকের দিন বাইশে শ্রাবণ। এই দুটি তারিখের বৃত্তে যাঁর জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিধৃত হয়ে আছে, তিনি একজন কবি। তাঁর আরো অনেক পরিচয় নিশ্চয় আছে, যার অনেকগুলোই স্বতন্ত্রভাবে বিশিষ্ট, তবু সব পরিচয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে ছবিটি সবচেয়ে গভীর, তা হলো এক কবির ছবি।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে একজন কবির জন্মদিন আমাদের একটি প্রধান জাতীয় উৎসব, সেই কবির মৃত্যুদিন আমাদের কাছে একটি অর্থবহ স্মরণোৎসব। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কিন্তু কবিকে দরকারী মানুষ বলে মনেই করি না। কবি বললেই আমাদের সামনে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, তা একজন কর্মে অপটু, এবং অকৃতী মানুষের অবয়ব।

তবু, কেন একজন কবি-ই আমাদের জবনে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠলেন? আমাদের দেশে মনীষীর অভাব নেই, তথাপি একজন কবি কেন আমাদের সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা পান?

কবিকে আমরা সাংসারিক অর্থে যা-ই ভেবে থাকি না কেন, কবি শব্দের আরেকটি অর্থের দিকে মনোযোগ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই অর্থটি হলো, ক্রান্তদর্শী—যিনি অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পান।

ভেবে দেখতে হবে, আমরা চেষ্টা করলে কাউকে ইঞ্জিনীয়ার বানাতে পারি, ডাক্তার বানাতে পারি। আরো অনেক কিছু চেষ্টা ক'রে হ'তে পারে লোকে, কিন্তু চেষ্টা ক'রে কাউকে কবি বানানো যায় না। এ কথার মানে এ নয়, কবি কোনো সিদ্ধপুরুষ। তাঁকেও অবিশ্রাম, অনবরত চর্চা চালাতে হয়, সংগ্রাম করতে হয়—জীবনের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে। তথাপি, যিনি কবি হবেন, তাঁর

একটি জন্মগত ঝোঁক, ইংরিজী ক'রে বললে aptitude থাকে, যা তাঁকে আর সব কিছু থেকে আলাদা ক'রে দেয়।

'পোয়েটস্ আর দি আন্‌অ্যাকনলেজড্ লেজিসলেটরস অব দি ওয়ার্লড—কবিরাই, পৃথিবীর অনেক বিবর্তন ঘটিয়ে দেন।

কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উৎসব করার অবশ্য কিছু ব্যবহারিক সুবিধে আছে। তাঁর অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করারার জন্য কবিতার অভাব হয় না, গাইবার জন্য গান পাওয়া যায় অজস্র, নাটকও অনেক, আলোচনার জন্য গল্প উপন্যাস প্রবন্ধও অফুরন্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলতে কোনো একটা মূল বস্তুতে আমরা পৌঁছতে পারি কি? রবীন্দ্রনাথ কবি, সুরকার, গল্পকার, নাট্যকার, সমাজবিদ্, শিক্ষক, জমিদার—ইত্যাদি বহু সার্থক পরিচয়ে তাঁকে ভূষিত করা চলে। তিনি একজন নন, একাধিক মানুষ। তবে আসলে রবীন্দ্রনাথ কি? আসলে রবীন্দ্রনাথ কে? কে তিনি, যাঁর বয়স আজ একশো সোলো, আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি কখনো আমাদের জীবন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, কখনো বা সহযোগী?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হ'লে আমাদের খানিকটা পিছিয়ে যাওয়া দরকার। মধ্যযুগ পার হ'য়ে যখন রেনেসাঁস এলো, এখন পুরানো ভাবনা চিন্তাকে অস্বীকার ক'রে মানুষ বুদ্ধিগ্রাহ্য, যুক্তিগ্রাহ্য মতামত প্রকাশ করতে সুরু করলো। সেইটেই নবযুগের সূচনা, আধুনিক কালের আবির্ভাব।

এ দেশে এই ধারার পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায়। ভাবাবেগে চালিত না হয়ে সমাজচিন্তায় যুক্তিবাদীদের ধারাকে ইনিই প্রথম নিয়ে এসেছিলেন। রামমোহন রায় সারাজীবন একজন যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন,—guided by reason and regulated by science. তাঁর অনেক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা আমরা জানি। এই কর্মে তিনি প্রবৃত্ত হন নিশ্চয় কোনো একজন বা অনেক বিধবার সহমরণের নিষ্ঠুর দৃশ্যে বিচলিত হয়েই, কিন্তু তাকে তিনি পরিচালনা ক'রেছিলেন তাঁর যুক্তিবাদী ভাবনার সাহায্যে। দেশময় তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন সকলকে তাঁর চিন্তার সারবত্তা বোঝাবার জন্যে। এমনকি বেন্টিঙ্ক যখন এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে চান, তখন রামমোহন তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, চাপিয়ে দেওয়া আইনে মানুষকে আরো বিরূপ ক'রে তোলা হবে তার আগে চাই জনমতের স্বীকৃতি। তার জন্য প্রস্তুতি চাই।

ধর্ম-ব্যবসা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার সংগ্রাম তিনি সুরু করেছিলেন। বশিষ্ঠের দুটি শ্লোক তাঁর প্রিয় ছিল, তার অনুবাদ করেছিলেন তিনি—If Braluna says something unreasonable, it must be discarded as a piece of straw, এবং, It is an admitted fact that Braluna can not do anything spectacular.

শাস্ত্রের অনুবাদ ক'রে তিনি সাধারণ লোকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, শাস্ত্রচর্চা বাতিল ক'রে Physics Chemistry পড়তে হবে। আইনের তাৎপর্য নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন, সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিলেন।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য মানুষ বিদ্যাসাগর। মানুষের জন্য মমতা যেমন তাঁর ছিল, তেমনি ছিল অক্ষয় পৌরুষ। তারই জোরে তিনি অসংখ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের তাগিদ তিনি অনুভব ক'রেছিলেন অসংখ্য বালবিধবাকে দেখেই কিন্তু তার জন্য যুক্তিনির্ভর তথ্যানুসন্ধান ক'রেই সংগ্রামে নেমেছেন। শাস্ত্র ঘেঁটে খুঁজে এনেছেন তাঁর যুক্তির অনুকূল তথ্য। বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর—উপহাস ক'রে এই যে গান বাঁধা হয়েছিল, তা অনেক ভিন্ন অর্থে সত্য হ'য়ে উঠলো।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ন্যায়, সাংখ্য পরিত্যাগ ক'রে পড়তে হবে মিলের লজিক। বাংলাভাষার উন্নতির জন্যই পড়তে হবে ইংরাজী। নারীর জাগরণ জাতির উন্নতির উৎস, তাই নারীদের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তাঁরই।

বিদ্যাসাগর ছাপাখানার ব্যবসা চালিয়েছিলেন কৃতিত্বের সঙ্গে। তাঁর প্রয়োজন ছিল অর্থের—আদর্শের জন্যই। তাঁর জীবন এবং তাঁর উইল তার সাক্ষ্য দেবে। ছাপাখানার সাহায্যেই তিনি বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা ক'রেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এই ধারার উত্তরসাধক। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি রামমোহন রায়কে তাঁর জীবনের hero বলে বর্ণনা ক'রেছেন। সুতরাং এই যুক্তিবাদের ধারা তাঁর জীবনেও একটি সুনিয়ন্ত্রিত বেগবান, বহতা নদী হয়ে উঠবে, তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথকে জানতে গেলে এই কথাটি বুঝতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের

সেরা কবিদের মধ্যে একজন, অথবা সেরা গল্পকারদের একজন, বা একজন শ্রেষ্ঠ সংগীতকার—এই পরিচয়গুলো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নয়।

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে আমরা অন্য সাহিত্যিকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, ক'রে থাকিও। তাঁর কোনো কবিতায় শেলীর মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে এঁরা দুজনে সমশ্রেণীর। শেলীর সঙ্গে ইংলণ্ডের রোমান্টিক যুগ ছাড়া আর কোনো যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত। টি.এস. ইলিয়ট তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, যে তার অতীতকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে, সেই পারে ভবিষ্যতের জন্য কিছু দিয়ে যে.ত। একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত ঐতিহ্যকে দেখতে পাই। উপনিষদ না প'ড়ে, রবীন্দ্রনাথ পড়লেই উপনিষদ পড়তে পারি; বৈষ্ণব কবিতা না প'ড়ে 'গীতাঞ্জলি' পড়লেই বৈষ্ণব রস আস্বাদন করা যায়।

রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তিনি গোড়াতেই পরিণত যুক্তিবাদী ছিলেন না। যত দিন গিয়েছে, যত অভিজ্ঞতা হয়েছে, ততই তিনি নিজেকেই বারবার অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনিও, অনেকের মত, ধর্ম-বিষয়ে সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে প্রথম যুগে বর্ণভেদ ছিল। অব্রাহ্মণ শিক্ষককে ব্রাহ্মণ ছাত্র প্রণাম করতো না। আহারের স্থানেও এই বিভেদ মানা হতো। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পরে, যখন তাঁর বিধবা স্ত্রীকে পিতৃকুল থেকে পুনরায় বিবাহ দেবার আয়োজন করা হয়, তখন সে কার্যে নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গিয়েছিলেন।

কিন্তু এ সমস্তই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন থেকে খসে পড়েছিলো। পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিধবাবিবাহ দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে বিপ্লবাত্মক। রবীন্দ্রনাথের ধর্মের চরিত্রও পাল্টে গিয়েছিলো। শেষজীবনে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বললেন, ঈশ্বর মানব অতিরিক্ত কিছু নন। 'শেষকথা' গল্পে বললেন, ঈশ্বর ইতিহাসের প্রথমে নেই, আছেন শেষে। মানুষই উন্নীত হবে সেইখানে।

তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে বোধহয়। এই উপন্যাসের নায়ক তার সমস্ত ধর্মের ধ্বজাকে ভেঙে ফেলে মানবতার উদার আকাশের নীচে এসে দাঁড়ালো। অত্যন্ত কৌশলে রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীতে তাঁর আত্মজীবনীর একটি অংশকে বিবৃত ক'রে গিয়েছেন। 'গোরা'র পরিণতি, সূক্ষ্মভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই।

রাজনীতির কোলাহল যখন তুঙ্গে উঠেছে, গান্ধীজীর চরকা কাটার ডাকে যখন সাড়া দিয়েছে সবাই, তখন একা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, প্রাপ্তিটা বড়ো হবে, অথচ উপায়টা হবে ছোটো, এ হতেই পারে না। 'সত্যের আহ্বান', 'চরকা' ইত্যাদি প্রবন্ধে সেসব কথা ছড়িয়ে আছে। বিলিতী পোশাক পোড়ানোর সস্তা উল্লাসে যখন সবাই পাগল, তখন একজন কবি কি ভেবেছিলেন, 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস পড়লে, তা জেনে অবাক হ'তেই হয়।

সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তি উদ্বোধনের কথা বলে গেছেন। গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য রাজার দিকে নয়, নিজের সমাজের চেষ্টার দিকে চাইতে হবে।

নিজে জমিদার হয়েও রবীন্দ্রনাথ চাষীদের উন্নতির জন্য সমবায় প্রথা, ট্র্যাকটর চালু ক'রেছিলেন। নোবেল প্রাইজের টাকা নিয়ে পাতসরে খুলে দিয়েছিলেন ব্যাঙ্ক। সে ব্যাঙ্ক অল্পদিনেই উঠে যায়। সারাজীবনে কখনো কবির মুখে এই নষ্টের জন্য কোনো আক্ষেপ কেউ শুনতে পায়নি। দেশের বেদনাই তাঁকে বাধ্য ক'রেছিল শ্রীনিকেতন সুরু করতে।

শিক্ষার প্রাণহীনতার বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় প্রয়াসের কথা নতুন ক'রে বলার দরকার দেখি না। শিক্ষার উদ্দেশ্য চিত্তকে ঘা মেরে জাগিয়ে তোলা—এই সহজ কথাটি বলতে পারা তখন কঠিন ছিল। তার জন্য এক কবিকে অবিরল পরিশ্রম ক'রে যেতে হয়েছে।

আজ আমরা বনকে সম্পদ বলে মানতে শিখেছি, অনেক অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষরোপণ সুরু ক'রে গিয়েছেন।

আজ যে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তার অন্ত নেই আমাদের, সেই উদ্দেশ্যে মিসেস স্যাঙ্গারস্ একবার এসেছিলেন ভারতবর্ষে। গান্ধীজী তাঁকে প্রত্যাখান করেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তখনই, এই কল্পনাকে স্বাগত জানান। অবাঞ্ছিত সন্তান রোধ প্রয়োজন—দারিদ্র দূরীকরণের জন্য এবং মায়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ নিবারণের জন্য। একথা বলেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ যা ক'রেছেন, তা হলো বাংলা ভাষাকে কয়েকশো বছর এগিয়ে দেওয়া। তাঁর প্রথম জীবনের 'বউঠাকুরাণীর হাট' থেকে 'তিন সঙ্গী', 'চতুরঙ্গ' পর্যন্ত এলেই বোঝা যাবে, কতটা বিরাট সময় আমরা কত অল্প সময়ে পার হয়ে এলাম। এক সুবিশাল ভাগবত এবং ভাষাগত পরিবর্তন ঘটে গেল। ইংরাজী সাহিত্যের অনেক দিকপাল অল্পায়ু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অল্পায়ু হ'লে

চিরস্থায়ী হ'তেন না। তাঁর কারণ বাংলাভাষার শৈশব। যত রবীন্দ্রনাথের বয়স বেড়েছে, তত ভাষাকে নবজন্ম দিতে দিতে চলেছেন তিনি। ততই সার্থক হয়েছে **তাঁর রচনা।**

রবীন্দ্রনাথ এত কর্মযজ্ঞের মধ্যে মানুষের বিরোধ পেয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, শত অভিমান সত্ত্বেও, তিনি সবাইকে ভালবাসা দিয়ে গিয়েছেন। এইটাই ছিল তাঁর আমরণ ব্রত। সেজন্যই মানুষের প্রতি বিশ্বাস তিনি হারাননি।

রাশিয়ার তীর্থক্ষেত্র দেখে অভিভূত হলেও, তিনি বলতে পেরেছিলেন, এ-ছাঁচ ফেটে যাবে। বোধহয় সেকথা আজ সত্য হ'তে চলেছে।

যে অর্থে একজন কবিই একজন সম্পূর্ণ মানুষ, সেই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ কবি। তাঁর 'কালের যাত্রা' নাটকের শেষ ভবিষ্যদ্বাণীর ছবি দেখার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। সমাজের অসাম্য, কেবলমাত্র শ্রেণীহীনের উঠতে উঠলেই, সমাপ্ত হবে না। হবে, যখন সেই সমাজে আসবে সুন্দরের চেতনা। সে কাজ হবে কবির।

রবীন্দ্রনাথ, তাই, একজন নন—তিনি সমস্ত উৎকৃষ্ট চিন্তার মিলনবিন্দু। তাঁর সমাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর কোনো অসঙ্গতি ছিল না, এমন নয়। জমিদারীকে পরগাছা বলে জানলেও, নিজে তাকে বিলিয়ে দিতে পারেন নি। ছেলেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে দুর্বল হয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু এবম্বিধ অসঙ্গতিই রবীন্দ্রনাথকে হিউমেন ক'রে তুলেছে। তিনি যে আমাদেরই লোক, একথা প্রমাণ করেছে তাঁর স্বাভাবিক দুর্বলতা। এবং সেই অসঙ্গতিকে ক্রমশঃ অতিক্রম ক'রেই তিনি আমাদের সামনে বড়োর চেতনাকে জাগ্রত করেন। জীবনে সমস্ত সঙ্কটের কিভাবে মুখোমুখি হ'তে হবে, তার অসংখ্য অসামান্য উদাহরণ তাঁর জীবন। নিজের স্বভাবের বিপরীত কর্মে লিপ্ত হ'তে নেই, একথা তিনি বারবার বলেছেন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের ভুল ব্যাখ্যা প্রায়শঃই হয়ে থাকে, তবু জীবনের শেষযামে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসেই বলেছেন, স্বভাবকে হত্যা করা সবচেয়ে বড়ো পাপ।

তাঁর সাহিত্যকৃতি যতো বড়োই হোক, মানুষ রবীন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক বড়ো। তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ—ভিন্ন প্রসঙ্গে লেখা এই পংক্তি দিয়েই তাঁর এপিটাফ লেখা চলে।

নিজের অজান্তেই একথা তিনি লিখে রেখে গিয়েছেন।

দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান বনাম কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ডি. এ. ভি. পি (ডাইরেকটোরেট অফ এ্যাডভারটাইজিং) দপ্তরের দীর্ঘকালব্যাপী মামলার রায় সম্প্রতি বেরিয়েছে। তাতে বিচারক স্পষ্টই বলেছেন একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনো পাব্লিক সেকটরে কোথাও ডি. এ. ভি. পি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞাপনের হার বা তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সর্ত আরোপ করতে পারেন না। সেটা মৌলিক অধিকারবিধি ও গণতন্ত্রবিরোধী। অথচ এতকাল ডি. এ. ভি. পি রেলওয়ে ও অন্যান্য পাব্লিক সেকটরে নিজেদের বিজ্ঞাপন হার আরোপ করতেন। কলকাতা হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি জি. এন. রায় তাঁর রায়ে বলেছেন "The rate now offered by the DAVP for its advertisements is meant for Government advertisements only, excluding the railways, and not for public sector undertakings" (The Statesman.—Calcutta. Thursday, July 16, 1981)

আদালতের এই নির্দেশের পর জানিনা ডি. এ. ভি. পি কর্তৃপক্ষ এখন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন কি না! অথবা রেলওয়ে ও পাব্লিক সেকটরের ক্ষেত্রে এতদিনকার প্রচলিত বেআইনী নির্দেশ তুলে নেবেন? অবশ্য একমাত্র রেলওয়ে ছাড়া অন্য কোনো পাব্লিক সেকটর ডি. এ. ভি. পি-র এই নির্দেশে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এটাই লিটিল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা। কিন্তু ডি. এ. ভি. পি তাদের নিজস্ব সরকারী বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও দুমুখো নীতি অবলম্বন করেছেন। স্টেটস্‌ম্যান ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে ডি. এ. ভি, পি. সেই কাগজগুলির বাৎসরিক কণ্ট্রাক্ট রেট মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য-কৃষ্টি সম্পর্কিত বা অন্যচরিত্রের ছোট কাগজের (অর্থাৎ যাদের প্রচার সংখ্যা দশ হাজারের কম) ক্ষেত্রে কিন্তু তারা তাদের নিজের ইচ্ছেমত হারে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন এবং সে হার ছোট সীমিত আর্থিক সাধ্যের কাগজগুলিকে

গ্রহণ করাতে বাধ্যও করাচ্ছেন ঐ রেলওয়ে ও অন্যান্য পাব্লিক সেকটরগুলির বিজ্ঞাপন না পাওয়ার ভয় দেখিয়ে। অথচ তারা কি ভাবে ছোট কাগজের বিজ্ঞাপনের হার ঠিক করেন তা কখনই বিশ্লেষণ করে দেখান না। প্রচার সংখ্যা? বছরের হিসাবে কাগজের বয়স? প্রোডাকশন বা কাগজের মুদ্রিত বিষয়ের গুরুত্ব? —কোনটা ধরেন কখনই জানান না। তাদের নিজস্ব রীতিতে ঠিক করা বিজ্ঞাপনের হারের অঙ্কে তারা কি করে কোন হিসাবের পথ ধরে ধরে পৌঁছোন, অনেক চেষ্টা করেও আমরা তা জানতে পারিনি। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে আসলে হয়তো কোনো নিরপেক্ষ, দৃঢ়, নিয়মনিষ্ঠ রীতিই ছোট কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নেই, যা বড় কাগজ, অর্থাৎ বিপুল প্রচার সংখ্যার কাগজে কলাম-ইঞ্চ হিসাবে আছে।

কোন কাগজকে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা না দেওয়া বিজ্ঞাপনদাতার ইচ্ছাধীন। কিন্তু সেই হারকে খেয়ালখুশিমত কমিয়ে (কাগজের অনুমতি না নিয়ে) দেওয়ার এই রীতি অন্য কোনো সভ্য দেশে আছে কিনা জানিনা। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ডি. এ. ভি. পি-র বিজ্ঞাপনগুলো সবই ইনফরমেটিভ। যেমন "মদ খাওয়া খারাপ" "ঠিক সময়ে ট্যাক্স দিন" "আয়কর ফাঁকি দেবেন না"—ইত্যাদি। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে রিটার্ণ বা সেল ভ্যালু বলে, না এইসব বিজ্ঞাপনের একেবারেই নেই। তা যদি নাই থাকে তবে ছোট কাগজ, যাদের আপাত দীন কৃশ চেহারার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সৎ সৃষ্টিশীল নতুনকালের সাহিত্যের তেজী চেহারা এবং যেখানে জাতির কৃষ্টির প্রতিটি স্পন্দন সবচেয়ে আগে ধরা পড়ে, তাদের ঠকিয়ে কি লাভ? যখন মাত্র কয়েকলক্ষ টাকায় এ সমস্যার সমাধান সহজেই করা যায়! গত পাঁচ বছরে কাগজের দাম, মুদ্রণব্যয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ বেড়ে গেছে শতকরা দুশো ভাগেরও বেশী, সেখানে বিজ্ঞাপনের হার ডি. এ. ভি. পি. কর্তৃপক্ষ ছোট কাগজের ক্ষেত্রে প্রায় বাড়ানিই বলা চলে। বরং অনেক ক্ষেত্রেই কমিয়ে দিয়েছেন! আমরাও বিজ্ঞাপন নিয়ে এত কথা লিখছি এ কারণেই যে ভাল লেখার সঙ্গে, বিজ্ঞাপনের আনুকূল্যও আমরা আশা করি। তা না হলে শুধু প্রচার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে কোন সাহিত্য পত্রেরই বেঁচে থাকা আজ অসম্ভব।

সৌভাগ্যের কথা আমাদের রাজ্যসরকার ছোট কাগজের ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ওয়াকিবহাল বলেই ছোট কাগজের ক্ষেত্রে দল-মত

নিরপেক্ষ একটি বিজ্ঞাপন নীতি তারা স্থির করেছেন। ফলে সব ছোট কাগজকেই তারা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, ছোট কাগজের যারা প্রতিশ্রুতিবান লেখক, অন্যান্য পরিজ্ঞাত লেখকদের সঙ্গে নতুনদেরও আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা অনুরূপ সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছেন। যদিও আমরা জানি শুধু সাহায্য দিয়ে লেখক শিল্পী তৈরী করা যায় না, কিন্তু অস্বীকৃতি ও তাৎক্ষণিক অসাফল্যজনিত যে গ্লানি, হতাশা, অনেক সময়েই সম্ভাবনাময় লেখক শিল্পীকে বিস্মৃতির আড়ালে নিয়ে যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অনুদান যদি তাদের ভগ্নাংশকেও সাহায্য করে তবে সত্যিকারের কিছু কাজ হবে।

কিন্তু "বঙ্কিম পুরস্কার" বিষয়ে সরকারী নির্বাচক কমিটির সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাতে পারছি না! সাহিত্যের বিচারের ব্যাপারে কোনো বই-এর যোগ্যতা বা অযোগ্যতার কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি; ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করা হয় যখন নিজ রাজ্যের বিচারকরাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে গত এক দশকে কোনো উল্লেখযোগ্য (বঙ্কিম পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল বিগত দশ বছরে উল্লেখযোগ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাঙলা উপন্যাসটিকে) উপন্যাস বাংলা দেশ থেকে প্রকাশিত হয়নি, তখন সর্বভারতীয় কোন পুরস্কার বাংলা সাহিত্যকর্মকে দেওয়া আদৌ সঙ্গত কিনা? এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সর্বভারতীয় এবং বহির্বিশ্বে পড়লে আমাদের বলার কিছুই থাকবে না।

বিভাবের আগামী সংখ্যাই শারদীয় সংখ্যা। বিশেষ বর্দ্ধিত কলেবরে আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চিঠিপত্র

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনার সম্পাদিত 'বিভাব' আমাকে আকৃষ্ট করে। শুধু এর নামটি কেন, এর আকার, এর পরিচ্ছন্নতা সবার ওপর এর ভিতরের সুনির্বাচিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখাগুলি যেমন সুখপাঠ্য তেমনই জ্ঞানগর্ভ।

এই পত্রিকার পরিচালনার পিছনে যে যত্ন ও সতর্কতা বর্তমান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনার পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

নমস্কারসহ
শ্রীপ্রফুল্লকিশোর মুখোপাধ্যায়
আড়িয়াদহ কালাচাঁদ হাইস্কুল
কলিকাতা-৫৭

সম্পাদক সমীপেষু,

সাম্প্রতিক সংখ্যা 'বিভাব' পড়ে স্নিগ্ধ একটা অনুভূতির স্পর্শ পেলাম। পত্রিকা সমাকীর্ণ বর্তমান সময়ে এই পত্রিকাকে আলাদা করে বেছে নেওয়া যায় এর মার্জিত এবং রুচিস্নিগ্ধ বিষয়বস্তুর জন্যে। বুদ্ধি এবং হৃদয়কে একই সঙ্গে দোলা লাগিয়ে যা অন্তত কিছুটা বোদ্ধিক বস্তু সঞ্চয়ের সুযোগ দেয় তার মধ্যেই তো পত্রিকার সার্থকতা।

শুধু আশঙ্কা, এই চটকদারীর যুগে 'বিভাব' না নিজেকে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে!

নমস্কার
রথিন মিত্র
কলকাতা-৪

সবিনয় নিবেদন,

কয়েক সংখ্যা থেকে লক্ষ্য করছি প্রবন্ধ বিষয়টির ওপর আপনারা যেন একটু কম জোর দিচ্ছেন। অবশ্য মননশীল প্রবন্ধ বা সত্যিকারের পরিশ্রম করে লেখা প্রাবন্ধিকের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে।

বিভাবে "গল্প" সুরু করে ভালই করেছেন। প্রফুল্ল রায়ের গল্পটি অনবদ্য। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ খুবই আকর্ষণীয়। যা হোক মূল কথা প্রবন্ধ, (যার ওপরই মূলত বিভাব দাঁড়িয়ে ছিল এতদিন) আরো ভাল প্রবন্ধ চাই।

নীতা নন্দী : নিউ দিল্লী-১

বিভাব প্রকাশনীর বিশেষ উদ্যোগ

উল্লেখযোগ্য ভারতীয় ছবির পেপারব্যাক চিত্রনাট্য সংকলন

বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায়

১৯৮০-র স্বর্ণকমল প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র "**শোধ**" (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "গরম ভাত" গল্প অবলম্বনে)। দাম—সাত টাকা
চিত্রনাট্য—**সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/বিপ্লব রায় চৌধুরী** / উপদেষ্টা—**বিজয় তেণ্ডুলকর**

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র হিসাবে স্বর্ণময়ুর পুরস্কৃত "**আকালের সন্ধানে**" (অমলেন্দু চক্রবর্তীর কাহিনী অবলম্বনে)। চিত্রনাট্য—**মৃণাল সেন** / দাম—আট টাকা

১৯৭৮-র রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র "**দূরত্ব**" (শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে)। চিত্রনাট্য—**বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত** / দাম—পাঁচ টাকা

জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে ও প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায় "**নিম অন্নপূর্ণা**" (কমলকুমার মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে)। চিত্রনাট্য—**বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত** / দাম—পাঁচ টাকা

BIVAV

Price Rs. 4.00 | APRIL—JUNE | Rg. No.
V01.5 No. 1 | Published in JULY-81 | RN 30017/76

দেখুন

সোসাইটিতে রোজ ৪টি শো

এবং

মিনার, বিজলীতে রোজ দুপুরের শো